অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY
AGARTALA
75840
29/3/82

REFERENCE

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

Achintyakumar Rachanavali (Vol-VIII).
(Collected writings of Achintyakumar Sengupta)
Price : Rs. 30·00

সম্পাদনা
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রকাশক
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১/এ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মুদ্রাকর
দুলাল চন্দ্র ভুঞা
সুদীপ প্রিন্টার্স
৪/১-এ সনাতন শীল লেন
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
শৈলেন শীল
সমরেশ বসু

মূল্য : ত্রিশ টাকা

সূচীপত্র

জীবনী-সাহিত্য :

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (২য়) ৩

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (৩য়) ১৭৭

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ ৩৪৫

তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থ-পরিচয় ৫৯৫

আলেখ্য-সূচী

বিবেকানন্দ ১

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ ৩৪৫

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৫৯৫

জীবনী-সাহিত্য

ধ্যানস্থ দেখে বললুম, ও নরেন্দ্র। একটু চোখ চাইলে। বুঝলুম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বললুম, মা, ওকে মায়ায় বন্ধ কর। তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। বচনবাগীশরা বক্তৃতা করুক। নাম যশ আর কামিনীকাঞ্চন নিয়ে তারা বিভোর থাক। আমরা যেন ব্রহ্মলাভের জন্যে—ব্রহ্ম হওয়ার জন্যে দৃঢ়তর হই।

বিবেকানন্দ

গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যা, পরের মুক্তি হোক—আমার মুক্তির বাপ নির্বংশ। আপনার ভালো কেবল পরের ভালোয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তিও পরের মুক্তি-ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যা, মেতে যা, উন্মাদ হয়ে যা।

বিবেকানন্দ

দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে নিম্নলিখিত পুস্তকাবলীর উপর নির্ভর করেছি :

শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
শ্রীপ্রমথনাথ বসুকৃত স্বামী বিবেকানন্দ
মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী
সরলাবালা সরকার লিখিত স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ
The Life of Swami Vivekananda (Advaita Ashrama)
The Master as I saw him by Sister Nivedita
স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকৃত স্বামীশিষ্যসংবাদ

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

ভূমিকা

জন্ম থেকে শুরু করে আমেরিকায় রওনা হওয়া পর্যন্ত প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ড আমেরিকা জয় করে ইংলণ্ডে প্রথম পাড়ি।

'ইংলণ্ড আমরা ধর্মবলে জয় করব, অধিকার করব ধর্মবলে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। সভাসমিতি করে কি এ দুর্দান্ত অসুরের হাত থেকে উদ্ধার করা যাবে? অসুরকে দেবতা করতে হবে। আমার এই এখন মহামন্ত্র, ইংলণ্ড-বিজয়, ইউরোপবিজয়। তাতেই দেশের কল্যাণ। বিস্তারই জীবনের চিহ্ন। আমাদেরও সমস্ত জগৎ জুড়ে আমাদের ধর্মাদর্শগুলি প্রচার করতে হবে।'

সমস্ত জগৎকে বলতে হবে হিন্দুর ঈশ্বর সর্বভূতময়, সর্বভূতের অন্তরাত্মা। মানুষ ছাড়া তিনি কিছু নন। সমত্বদর্শনই হিন্দুর ঈশ্বর-আরাধনা। যে আত্ম-সাদৃশ্যে সর্বত্র সমান দেখে সেই ঈশ্বরে পরমযুক্ত। তাই হিন্দুর বেদান্তই বিশ্বপ্রেমের ভিত্তি। মনুষ্যপ্রীতিই ঈশ্বরভক্তির মূল।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন পূজিছে ঈশ্বর॥

'ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে কূর্মাবতারের পূজা চাই, পেট হচ্ছেন সেই কূর্ম। একে আগে ঠাণ্ডা না করলে তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছিস না পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির। খালি পেটে ধর্ম হয় না, বলতেন না গুরুদেব? ঐ যে গরিবগুলো পশুর মত জীবনযাপন করছে, আমরা আজ চার যুগ ধরে ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি আর দু পা দিয়ে দলেছি। এরা না উঠলে দেশ জাগবে না। একটা অঙ্গ পড়ে গেলে অন্য অঙ্গগুলি সবল থাকলেও ঐ দেহ দিয়ে কোনো বড় কাজ হয় না। তোরা সব কী করলি বল দেখি? পরার্থে একটা জন্ম দিয়ে দিতে পারলি না? আর জন্মে এসে বেদান্তফেদান্ত পড়িস—এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা।'

বিবেকানন্দের ডাক তাই পরম বিস্তারের ডাক। বিবেকানন্দের গৌরব সত্যের গৌরব, প্রেমের গৌরব, মঙ্গলের গৌরব, কঠিনবীর্য নির্ভীক আত্মোৎসর্গের গৌরব।

অচিন্ত্যকুমার

আঠারোশ তিরানব্বই সালের একত্রিশে মে জাহাজ ছাড়ল স্বামীজির। তাঁর বয়েস তখন ত্রিশ বছর সাড়ে চার মাস।

দণ্ড কমণ্ডলু আর কৌপীন যাঁর একমাত্র সম্বল জাহাজে তাঁকে এক বিস্তীর্ণ লটবহর সামলাতে হচ্ছে, পোশাকের আর বিছানার, ট্রাংক আর ওয়ার্ডরোববোঝাই যত বিচিত্র আচ্ছাদন। এ সব কি আমার কর্ম! এ সবের তদারক করতে-করতেই কি সমস্ত শক্তি ব্যয় হয়ে যাবে? কিন্তু উপায় নেই, মহাকালের নির্দেশ পালন করতে চলেছি— আর ঠাকুর বলে দিয়েছেন, যখন যেমন তখন তেমন।

অন্তর্জ্যোতির্ময় দীর্ঘদেহ পুরুষ, সিংহের মত বিচরণ করছে। স্বয়ং কাপ্তেন পর্যন্ত আকৃষ্ট না হয়ে পারছে না। নিজের থেকে জুড়ে দিয়েছে গল্প, জাহাজের কলকব্জা এটা-সেটা সব বোঝাচ্ছে সযত্নে আর সবতাতেই স্বামীজির শিক্ষার্থীর মত কৌতূহল। যাত্রীদের সঙ্গেও আলাপ জমে গেছে, আলাপের থেকে অবধারিত বন্ধুত্ব। বিদেশী খাদ্য বিদেশী রীতিপদ্ধতি বিদেশী পরিবেশ, তবু খাপ খাওয়াতে বেগ পেতে হল না। সদাজাগ্রত তীক্ষ্ণ মনের কাছে কোনো সংস্কারই বন্ধন নয়।

সাতদিন পরে কলম্বোতে জাহাজ পৌঁছুল। পুরো একদিন থামবে। স্বামীজি শহর দেখতে বেরুলেন। গাড়ি করে গেলেন প্রসিদ্ধ বুদ্ধমন্দিরে যেখানে বুদ্ধের সুবিশাল মূর্তি—পরিনির্বাণমূর্তি—শুয়ে আছে। তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলেন বুদ্ধকে।

মানুষকেই বড় করেছেন বুদ্ধ, মানুষের মুখকে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন দেবতার দিক থেকে, ফিরিয়ে দিয়েছেন নিজের দিকে, আত্মশক্তির দিকে। মানুষ হীন নয় পরাধীন নয়, মানুষ তার উদ্যমে ও অধ্যবসায়ে মহীয়ান।

নিরন্তর চেষ্টা নিরন্তর আগ্রহ—নিরন্তর দাঁড় টেনে যাওয়া। হীনবল হীনসাহস না হওয়া। 'কখনো হীনসাহস হবিনি। খেতে শুতে পরতে, গাইতে বাজাতে, কলরোলে কেবলই সৎসাহসের পরিচয় দিবি। ভাবিব আমি কার সন্তান? তবে কেন আমার এই দুর্বলতা? হীনবুদ্ধি হীনসাহসের মাথায় লাথি মেরে, আমি বীর্যবান, আমি মেধাবান, আমি ব্রহ্মবিৎ—বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠবি। রামপ্রসাদের গান শুনিসনি? তিনি বলতেন, এ সংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী। এমনি অভিমান সর্বদা জাগিয়ে রাখতে হবে। তাহলে মনে কখনো দুর্বলতা আসবে না। মহাবীরকে স্মরণ করবি। তাহলেই মহামায়া কৃপা করবেন।'

বনপথ দিয়ে যাচ্ছেন নারদ, কাহিনী বলছেন স্বামীজি, দেখতে পেলেন একাসনে বসে এক যোগী ধ্যান করছে নিশ্চল হয়ে। তার চারদিকে ছোট-বড় বিচিত্র উইয়ের ঢিবি উঠে গেছে। তবু স্থান বদল নেই যোগীর, এমন অনন্যলক্ষ সাধনা। নারদকে দেখতে পেয়ে যোগী জিগগেস করলে, প্রভু কোথায় যাচ্ছেন?

নারদ বললে, বৈকুণ্ঠে যাচ্ছি।

তাহলে দয়া করে নারায়ণকে জিগগেস করবেন, আমার আর মুক্তির দেরি কত? মিনতি করে বললে সেই যোগী।

কতদূর এগিয়েছেন নারদ, আরেকজনের সঙ্গে দেখা। তার সাধন-ভজন কিছু নেই ধ্যান-সমাধির সে ধার ধারে না। সে শুধু লম্ফ-ঝম্ফ করছে আর গান গাইছে। সে গানেও না আছে সুর না আছে তালমান। কণ্ঠস্বরও বিকৃত-কর্কশ। নারদকে দেখে উল্লসিত হয়ে সে জিগগেস করলে, কোথায় চলেছেন প্রভু ?

বৈকুণ্ঠে।

বাঃ, তাহলে একবার জিগগেস করবেন তো ভগবানকে, আমার মুক্তির আর কতদিন !

বৈকুণ্ঠ থেকে তারপর যখন ফিরছেন নারদ, সেই বল্মীকস্তূপাবৃত যোগীর সঙ্গে ফের দেখা। যোগী জিগগেস করল, আমার কথা বলেছিলেন নারায়ণকে ?

বলেছিলাম।

কি বললেন নারায়ণ ?

বললেন, আরো চার জন্ম লাগবে।

আরো চার জন্ম ? বিলাপ করতে লাগল যোগী। এত যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম এত ক্লেশকৃচ্ছ্র, এত একাগ্রসংযোগ, চারদিকে বল্মীকস্তূপ উঠে গেল, তবু এখনো চার জন্ম বাকি ? যোগী আর্তনাদ করতে লাগল।

আরো কিছুদূর এগিয়ে সেই নাচুনে লোকটার সঙ্গে দেখা।

কি হে দেবর্ষি, আমার কথা জিগগেস করেছিলে ভগবানকে ?

করেছিলাম।

কি বললেন ? আরো কত জন্ম ?

তোমার সামনে এই তেঁতুল গাছ দেখতে পাচ্ছ ?

পাচ্ছি।

এর কত পাতা পারছ গুণতে ?

ওরে বাবা, অসংখ্য অগণন —

ও গাছে যত পাতা, ভগবান বললেন, তোমার তত জন্ম বাকি !

আনন্দে নৃত্য করতে লাগল সেই লোক। বলতে লাগল, এত শিগগির ? এত শিগগির ? এত কম জন্ম ? এত অল্প সময় ?

নারদ বিমূঢ়ের মত রইল তাকিয়ে।

সেই লোকটা বলতে লাগল, তবু আমি যে আমি, আমারো তো একদিন মুক্তি হবে, আমিও একদিন পাব সেই পরমপদ। কি মজা ! হোক লক্ষ জন্ম, হোক কোটি জন্ম, কোটি-কোটি জন্ম, তবু একদিন আমারো তো হবে সেই অধিকার, তাইতেই আমি কৃতার্থ। আমি কিছুতেই নিরুদ্যম নই আমার যাত্রায়, কিছুতেই অবসাদ নেই আমার অধ্যবসায়ে —

বৎস, দৈববাণী হল, এই মুহূর্তেই তুমি মুক্ত। যে উদ্যমশীল যে অধ্যবসায়সম্পন্ন উচ্চতম ফল শুধু তারই প্রাপ্য।

কলম্বো থেকে পেনাঙ, পেনাঙ থেকে সিংগাপুর। সিংগাপুরে নামলেন স্বামীজি। গেলেন বোটানিক্যালগার্ডেন দেখতে। কত জাত ও চেহারার পাম-গাছই না এখানে লালিত হচ্ছে। এই সেই রুটিফলের গাছ। মাদ্রাজে যেমন আম অপর্যাপ্ত এখানেও তেমনি ম্যাঙ্গোস্টিন। ম্যাঙ্গোর সঙ্গে ম্যাঙ্গোস্টিনের কি তুলনা হয় ? আম হচ্ছে অমৃতের নামান্তর।

সিঙ্গাপুর থেকে হংকং। হংকঙেই বিশাল চীনের প্রথম আভাস, এই সেই চীন, স্বপ্ন আর রূপকথার রাজ্য। কে জানে তাদের কর্মচাঞ্চল্যই হয়তো রূপকথা, তাদের কর্মনৈপুণ্যই বুঝি স্বপ্নের মত। জাহাজ পারে নোঙর করার সঙ্গে সঙ্গেই শয়ে-শয়ে নৌকো এসে হাজির, ডাঙায় নিয়ে যাবে। আর সেই সব নৌকোর মাঝি মেয়ে। নৌকোও অদ্ভুত, দুটো করে হাল। মেয়ে মাঝি একটা হাল হাত দিয়ে আরেকটা হাল পা দিয়ে চালাচ্ছে এক সঙ্গে, ছন্দের এতটুকুও হেরফের হচ্ছে না। আর সব চেয়ে মজা, তাদের পিঠে একটা করে ছেলে বাঁধা, যার যেটা কনিষ্ঠ। ছেলেগুলোর একটুও ভয় নেই, একটুও কান্নাকাটা করছে না, বরং দিব্যি হাত-পা নাড়ছে, তাকাচ্ছে মিটমিট করে। প্রাণপণ শক্তিতে মা-রা নৌকো চালাচ্ছে, বোঝা সরাচ্ছে, এক নৌকো থেকে আরেক নৌকোয় লাফিয়ে পড়ছে, যে কোনো মুহূর্তে শিশুটোর 'টিকিওলা মাথাটা গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে, তাতে মা ও শিশুর কারুরই ভ্রূক্ষেপ নেই। মাঝে মাঝে মা যে তাকে একটু করে ভাতের মণ্ড খেতে দিচ্ছে তাইতেই শিশু মহাপ্রসন্ন। যে মায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তার আর ভয় কি, অভাব কি। রাখতে হলেও মা ফেলতে হলেও মা। মায়ের কাছে যদি আঘাত পাই মায়ের কাছেই আবার উপশম পাব।

এই প্রথম উপলব্ধি হল স্বামীজির, চীন কত দরিদ্র, ভারতবর্ষেরই মত। সভ্যতার যারা ভিত্তি তারা যে সোপান ধরে উঠতে পারছে না উচ্চচূড়ে তার কারণই হচ্ছে দারিদ্র্য, সবচেয়ে যা কঠিন শৃঙ্খল। নিত্য অভাব ও দারিদ্র্যের তাড়নায় যারা উদ্‌ভ্রান্ত তাদের অন্য চিন্তা করবার সময় কোথায়? পেটে যার ভাত নেই মাথায় তার কি থাকবে?

হংকং থেকে ক্যান্টন। শুনলেন এখানে অনেক চীনে মঠ আছে, একটা কোথাও দেখে আসি। খোঁজ নিয়ে জানলেন বিদেশীদের সেই মঠে ঢোকবার অধিকার নেই। অধিকার নেই? স্বামীজির রোক চাপল। কি হয় যদি বিদেশী কেউ ঢোকে? স্বামীজির দোভাষী বললে, খুন করে ফেলে। চলোই না দেখি না, কেমন খুন করে। যারা মঠবাসী তারা বুদ্ধাশ্রয়ী আর তারা নিশ্চয়ই জানে বুদ্ধের জন্ম হিন্দুর দেশ, ভারতবর্ষে। যদি তাদেরকে জানানো হয় তিনি সেই ভারতবর্ষের একজন হিন্দু সাধু তবে নিশ্চয়ই তারা ছেড়ে দেবে দরজা, আমাকে মনে করবে তাদের সহোদর-সগোত্র। দোভাষী তবু দ্বিধা করতে লাগল। স্বামীজি বললেন, 'আগেই পালাই কেন, দেখি না তাদের কেমন অভ্যর্থনা।'

কেমন অভ্যর্থনা? ফটকের কাছে যেতেই চার-চারজন মঠবাসী হাতে গদা নিয়ে মার-মার শব্দে তেড়ে এল।

ঐ, ঐ দেখুন। ভীতব্যস্ত দোভাষী পালাবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল।

তার হাত চেপে ধরলেন স্বামীজি। বললেন, 'পালাতে চাও পালাবে, আমি একাই মরব, কিন্তু যাবার আগে বলে যাও চীনে ভাষায় ভারতবর্ষের যোগীকে কি বলে?'

অস্ফুটস্বরে সেই প্রতিশব্দটা উচ্চারণ করে দোভাষী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে দিল।

দূর হতে শঙ্খের ধ্বনির মত ঘোষণা করলেন স্বামীজি, আমি যোগী, আমি ভারতবর্ষের যোগী।

সাপের ফণায় ধুলো পড়ল। যে হাত প্রহারে উদ্যত ছিল তা প্রণামে অবনত হল। আপনি যোগী? আসুন আসুন আমাদের মঠে। আমাদের ধন্য করুন।

মুহূর্তে ইন্দ্রজাল ঘটে গেল দেখে দোভাষী এগুলো ধীরে ধীরে। বিচিত্রশব্দে লোকগুলো কোলাহল করতে লাগল। একবর্ণ বোঝেন স্বামীজির সাধ্য কি। শুধু

একটা কথা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে। সে কথাটা হচ্ছে 'কবচ', আর তাদের হাতের ভঙ্গি থেকে অনুমান করতে পারছেন, হিন্দু যোগীর কাছে তারা কবচ চাইছে। দোভাষীকে জিগগেস করলেন স্বামীজি, 'কবচ কথাটার কি মানে ? কি চাইছে ওরা ?'

'ওরা কবচই চাইছে, মন্ত্রপূত কবচ, যাতে করে ওরা ভূতপ্রেত বা অশুভ আত্মার থেকে রক্ষা করতে পারে নিজেদের। আর কিছু নয়, আপনার কাছ থেকেই ওরা ত্রাণ চায় আশ্রয় চায়।'

এই কথা ? স্বামীজি পকেট থেকে শাদা কাগজ বের করলেন ও তাকে ভাঁজ করে করে টুকরো-টুকরো করলেন ও প্রতিটি টুকরোতে সংস্কৃত অক্ষরে লিখলেন, ওঁ, তত্ত্বাতীত সত্যের যা ঘনীভূত মন্ত্র। প্রত্যেককে দিলেন একটি টুকরো। প্রত্যেকে শ্রদ্ধানত মাথায় তা গ্রহণ করল। প্রণাম করল স্বামীজিকে, মঠের মধ্যে নিয়ে চলল। মঠের মধ্যে অগণিত সংস্কৃত পুঁথি, আর কি আশ্চর্য, সেই সব সংস্কৃত বাংলা অক্ষরে লেখা। বৌদ্ধদের যে দারুময় মূর্তি সাজানো আছে, সব যেন বাঙালির মুখ। কত বাঙালি ভিক্ষু না এসেছিল চীনে বুদ্ধের অনির্বাণ নির্বাণবাণীর দীপ নিয়ে। তারা আজও জ্বলছে, আজও জাগছে স্বামীজির চোখে। স্বামীজিকে প্রসন্ননেত্রে আশীর্বাদ করছে।

ক্যান্টন থেকে আবার হংকঙে ফিরলেন স্বামীজি, হংকং থেকে জাপানের অভিমুখে।

প্রথমে নাগাসাকি। নাগাসাকি থেকে কোবে। কোবেতে জাহাজ ছেড়ে দিয়ে ট্রেন নিলেন, উদ্দেশ্য শুধু বন্দর নয় মধ্যবর্তী প্রদেশটাও একটু দেখি। ওসাকা, কিয়োটো আর টোকিয়ো ঘুরলেন। সমস্ত দেশ শিল্পে-বাণিজ্যে যন্ত্রে-অস্ত্রে চিত্রে-স্থাপত্যে জেগে উঠেছে, মেতে উঠেছে। বড়-বড় পা ফেলে সঙ্গ ধরেছে পশ্চিমের। কিসে দেশের সর্বাঙ্গীণ হিত হবে, সভ্যতার আবাস থেকে দারিদ্র্য নির্বাসিত হবে সমস্ত জাতি এই এক লক্ষ্যে প্রেরিত। ধর্মেও পিছিয়ে নেই। আর আশ্চর্য, মন্দিরের গায়ে সংস্কৃত মন্ত্র বাংলা হরফে লেখা।

যা কিছু সৎ আর মহৎ, জাপানীদের কাছে, ভারতবর্ষই তার স্বপ্নরাজ্য।

কি করছ তোমরা ? ইয়াকোহামায় এসে তার মাদ্রাজী শিষ্যদের লিখছেন স্বামীজি : সারাজীবন কেবল বাজে বকছ। এস একবার এদের দেখে যাও, তারপর গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও। ভারতবর্ষের যেন ভীমরতি ধরেছে। দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়! হাজার বছরের কুসংস্কারের বোঝা কাঁধে নিয়ে বসে আছ, শুধু খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করে শক্তিক্ষয় করছ। পুরোতগুলির আহাম্মকির আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছ। শত শত যুগের অবিরাম অত্যাচারে তোমাদের ভিতরের মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তোমরা কী বলো দেখি।

এস, মানুষ হও। আরো লিখছেন বিবেকানন্দ : তোমরা কি দেশকে ভালোবাসো ? দেশের মানুষকে ভালোবাসো ? তা হলে দুষ্টু পুরোতগুলোকে আগে দূর করে দাও। যাতে আমাদের দেশের উন্নতি হয় তার জন্য লাগো প্রাণপণে। পিছনে চেয়ো না, কাঁদুক প্রিয়জন ; শুধু সামনের দিকে তাকাও, সামনের দিকে এগোও, হোক পথ চড়াই, হোক গন্তব্যস্থল দূরদূরান্তে। সামনে বাড়ো। ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়। কে আছ ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন দেবে, নিরক্ষরদের মাঝে শিক্ষা বিস্তার করবে আর যারা পূর্বপুরুষদের অত্যাচারে পশুর পদবীতে নেমে

এসেছে তাদের মানুষ করবার ব্রত নেবে! ধীর স্তব্ধ অথচ দৃঢ়—এই তিনমন্ত্র সার করে কাজ করো। মনে রাখবে নাম যশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

ইয়াকোহামা থেকে জাহাজ ছাড়ল। থামল ভ্যানকুভার। কানাডার কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে—বৃটিশ কলাম্বিয়া নামে যে দ্বীপ আছে তারই রাজধানী। এখান থেকেই যেতে হবে শিকাগো, ট্রেনে করে, কানাডার ভিতর দিয়ে। হাড়ে-দাঁত-বসানো শীত। সমস্ত জাহাজ প্রায় কাঁপতে-কাঁপতে এসেছেন। জামাকাপড় মন্দ ছিল না কিন্তু এই তীক্ষ্ণদংষ্ট্র শীতের কাছে যৎসামান্য। কেউ অনুমানও করতে পারেনি জুন-জুলাই মাসেই এমনি বরফ-গলা ঠাণ্ডা পড়বে।

একটানা ট্রেনে তিন দিনের দিন শিকাগোতে এসে নামলেন স্বামীজি। পথভ্রষ্ট শিশু যেমন করে তাকায় তেমনি করে তাকাতে লাগলেন চার দিকে। কোন্ দিকে যাবেন, কোথায় উঠবেন, কি করে বা সামলাবেন এ সব মালপত্র! তখন শিকাগোতে ওয়ার্লডস ফেয়ার বা বিশ্বমেলা বসেছে, তাই শহরে বিস্তর লোকের আমদানি। তাদের চোখের সামনে স্বামীজি এক কিমাকার-কিম্ভূত! গায়ে আলখাল্লা মাথায় পাগড়ি, এ কি কোনো সার্কাসের ক্লাউন না সাপুড়ে-বাজীকর! রাস্তার ছোঁড়াগুলো পিছনে লাগল, হাততালি দিতে লাগল, কেউ খেউ বা কাটতে লাগল টিটকিরি। যেন অজানা দেশের পথভোলা এক পাগল এসে উপস্থিত হয়েছে। একে শীত তায় অনাহার তায় এ উৎপাত।

'একটা হোটেলে নিয়ে যেতে পারো?' পথের একটা মুটেকে জিগগেস করলেন স্বামীজি: 'হ্যাঁ, যে কোনো হোটেল, যেটা সব চেয়ে কাছে?'

কত ভাড়া দেবেন? ভাড়ার হার আমি কি কিছু জানি? যা ন্যায্য তাই দেব অনায়াসে। ন্যায্য? যা চার আনা তাই মুটেদের ন্যায়ে চার টাকায় দাঁড়াল। লুব্ধের ন্যায় আর ক্ষুব্ধের ন্যায় কি এক? সমস্ত রাস্তা একটা মূর্তিমান তামাসা হয়ে, আশে-পাশের লোকজনের প্রচুর হাসি-আমোদ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের খোরাক জুগিয়ে অবশেষে পৌঁছুলেন এক হোটেলে। বিরক্ত বিধ্বস্ত বিলীনস্বপ্ন। থাকতে দেবে এখানে? দেব। কিন্তু টাকা দিতে পারবে তো?

দেখি যত দিন পারি। একটা চুরুটের দাম আট আনা। আমেরিকায় টাকা তো নয় খোলামকুচি। এক কণা মাটি রাখেনি যেখান থেকে সোনা না উৎপন্ন হয়। যেমন বিস্তীর্ণ দেশ তেমনি অফুরন্ত প্রাণশক্তি। তুমিও দাও মাটিও দেবে। তুমিও ঢালো মাটিও অঢেল হবে। এত প্রাপর্যাপ্ত যে একটা কুলির দিনে অন্তত দশটাকা রোজগার।

নোটে-নগদে একশো উনাশি পাউন্ড ছিল স্বামীজির কাছে, এরই মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ পাউন্ড বেরিয়ে গেছে। হোটেলেই এক পাউন্ড করে দৈনিক খরচ। তারপর যে পারছে ঠকিয়ে নিচ্ছে দুহাতে। এরকম ভাবে চললে কদিন পরেই তো ফতুর। তারপর কি আমি ভিক্ষায় বেরুব? আমেরিকায় ভিক্ষুক নেই, ভিক্ষেয় বেরুলে সটান শ্রীঘর। বিদেশে এসে কি শেষে জেলে যেতে হবে?

অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন স্বামীজি। তারপর খবর নিয়ে জানলেন শিকাগোর ধর্মসভা আরম্ভ হতে এখনো ঢের দেরি। এখন জুলাইয়ের মাঝামাঝি, সভা বসবে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। এত আগে না এলেও চলত। তা ছাড়া, বক্তৃতা যে দিতে চাও তোমার ডেলিগেটের টিকিট কই? ডেলিগেটের টিকিটই বা কি যাকে-তাকে দেওয়া যায়? তার জন্যে উপযুক্ত সার্টিফিকেট চাই। তা তোমার আছে? আর থাকলেই বা কি।

সে টিকিট দেবার দিনও শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন আর উপায় নেই, স্বস্থানে প্রস্থান করো।

যারা তাঁকে পাঠিয়েছে, ভেবে-চিন্তে নিয়মশৃঙ্খলার রাস্তা ধরে পাঠায় নি। ভেবেছে স্বামী বিবেকানন্দ একবার গিয়ে দাঁড়ালেই সভার রুদ্ধদ্বার খুলে যাবে, সে সভা যতই মদমত্ত হোক আর সে দরজা হোক যতই উদ্ধত-উত্তুঙ্গ। কিন্তু আইনকানুনের যে কত বায়নাক্কা তা কারু জানা ছিল না। নিজেও সাংসারিক রীতি-নীতির ধার ধারেননি স্বামীজি, তিনিও এসব বিষয় দেখেননি তলিয়ে। কিন্তু এখন দেখলেন অনেক লাল ফিতের জটিলতা, অনেক পত্র-পত্রিকার জঞ্জাল।

তবে আর কি। ঘরের ছেলে আবার বিবরে ফিরে যাই। কিন্তু আমি যে এখানে এসেছি এ আমি আমার নিজের ইচ্ছায় এসেছি ? আর কেউ কি আমাকে নিয়ে আসেনি হাত ধরে ? আমি নিজে পথ দেখতে পাচ্ছি না বলে আর কেউ কি আমাকে দেখছেন না ? আমিও তবে দেখে যাব শেষ পর্যন্ত।

৪৬

কপূরতলার রাজা এসেছেন শিকাগোতে। তাঁকে কেষ্টবিষ্টু ঠাউরে শিকাগোর সমাজ খুব মাতামাতি সুরু করেছে। তিনিও এমন একখানা ভাব করে আছেন যেন হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন। দেদার টাকা ওড়াচ্ছেন ফুর্তিতে। বইয়ে দিয়েছেন বিলাসের বন্যা।

ওয়ার্লর্ডস ফেয়ারে গিয়েছেন একদিন, স্বামীজির সঙ্গে দেখা। কে কোথাকার পথের ফকির, মুখ ফিরিয়ে নিলেন রাগে, কথাও কইলেন না।

ধুতি-পরা এক মারাঠী ব্রাহ্মণ, মাথায় পাগলামির ছিট, হাতের নখে কাগজে ছবি এঁকে বিক্রি করছে সেই মেলায়। রাজার অহংকার দেখে সে বেজায় খেপে গিয়েছে। খবরের কাগজের রিপোর্টার ঘুরছে চারদিকে, তাদের কয়েকজনকে জড়ো করে সেই পাগল রাজার নামে কেচ্ছা কাটতে লাগল। নানারকম মুখরোচক কাহিনী, শুনলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। রিপোর্টারদের লোভ হল এই সব কাহিনীর কিছু পাঠকসমাজে পরিবেশন করি। লুফে নেবে সংবাদ-ক্ষুধাতুরের দল। কিন্তু এই পাগলাটে লোকটাকে এ সব কাহিনীর স্রষ্টা বলে প্রচার করলে সত্যের মত শোনাবে না। ঐ কে একজন এসেছে না ভারতবর্ষ থেকে, রাজার স্বদেশ থেকে ? সৌম্যদর্শন, অনেক জ্ঞানের কথা বলে, ইংরেজী-জানা শিক্ষিত—স্বামীজিকেই নির্দিষ্ট করল সকলে—ওঁরই নামে চালিয়ে দেওয়া যাক। তা হলেই লোকে নেবে, সত্যের গন্ধ শুঁকে শুঁকে পড়বে কৌতূহলে।

হলও তাই। খবরের কাগজের দুই স্তম্ভ বোঝাই বেরুল রাজার কুকীর্তির গল্প। এ সব কার বলা ? আজেবাজে লোক নয়, ভারতবাসী এক বিখ্যাত পণ্ডিত, দূরস্থ নয় ইহাগত, নাম বিবেকানন্দ। কর্পূরতলাকে নামাবার জন্যে স্বামীজিকে এরা স্বর্গে তুলল, আবার যখন দরকার হবে স্বামীজিকে করা যাবে কুপোকাৎ। সে পাগল মারাঠি যা যা বলেছিল সব এনে বসাল স্বামীজির মুখে, স্থানে অস্থানে একটু বা রং চড়িয়ে। ফলে কর্পূরতলার খ্যাতি উড়ে গেল কর্পূরের মত। আর কে সেই পণ্ডিত ? হোটেলে ভিড় বাড়তে লাগল রিপোর্টারদের।

আমাকে দিয়েই আমার এক স্বদেশবাসীর অপযশ করানো হল ? একেই বলে সংবাদপত্রের সত্য। স্বামীজি প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু কে তা কানে তোলে ? যা হয়ে গেছে বেশ হয়েছে, এখন তোমার নিজের কথা বলো। মনে হয় তোমার ভিতরে আছে অনেক খবরের খাবার। উপবাসী দেশকে তাই এখন আমরা বিতরণ করি।

সম্প্রতি অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হচ্ছি এই আমার একমাত্র খবর। এ তো আর রিপোর্টারদের বলা যায় না। এমন বন্ধু নেই যার সঙ্গেও বা এ ব্যাপারে অন্তরঙ্গ হওয়া যায়, সুতরাং মাদ্রাজী বন্ধুদেরই ফের চিঠি লেখা যাক টাকা চেয়ে।

'যদি আমার এখানে থাকবার জন্যে টাকা না যোগাড় করতে পারো অন্তত যাতে দেশে ফিরে যেতে পারি তার রাহা-খরচটা পাঠিও। ধর্মসভা শুরু হতে এখনো ঢের দেরি, তা ছাড়া আমি ডেলিগেটের টিকিট পাইনি, আমার প্রবেশের অধিকার নেই। যে যেখান থেকে পারছে নানারকম ধোঁকা দিয়ে আমার থেকে টাকাপয়সা লুট করে নিচ্ছে। একটা কেবল্ যে করব সাহস পাই না। প্রতি শব্দের দাম চার টাকা।'

বারোদিন কাটলো শিকাগোয়—এ তো অনর্থক কালক্ষেপ। যদি অপেক্ষাই করতে হয় একটা সস্তার জায়গা দেখা ভালো। কিন্তু কোথায় যাই ? নিজে সস্তা হব না অথচ জায়গা সস্তা হবে এমন জায়গা কোথায় ? কেউ-কেউ বোস্টনের নাম করলে। আর দেরি নয়, বোস্টনের ট্রেন ধরলেন স্বামীজি।

শিকাগোর থিয়োসফিস্টরা খাপ্পা ছিল স্বামীজির উপর। স্বামীজির দুর্দশা দেখে তাদের বড় আহ্লাদ। পালিয়ে যাচ্ছে শুনে আরো ! তাদের একজন লিখল : শয়তানটা শিগগির মারা যাবে। ঈশ্বরের দয়ায় বাঁচবে সকলে।

'যদি কেউ তোমার গলা কাটতে আসে', লিখছেন স্বামীজি : 'তাকে না বোলো না। কারণ তুমি নিজেই নিজের গলা কাটছ। কোনো গরিবের কিছু যদি উপকার করো তাহলে বিন্দুমাত্র অহংকৃত হয়ো না। তা তোমার পক্ষে উপাসনা মাত্র। তাতে অহঙ্কারের কিছুই নেই। সমুদয় জগৎই কি তুমি নও ? এমন কোথায় কি জিনিস আছে যা তুমি-ছাড়া ? তুমিই জগতের আত্মা। তুমিই সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র। সমুদয় জগৎই তুমি। তুমি কাকে ঘৃণা করবে, কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবে ? শুধু জেনে রাখো তিনিই তুমি। আর সমুদয় জীবন ঐ ছাঁচে গড়ে তোলো। যে এই তত্ত্ব জেনে জীবনকে সেইভাবে গড়ে তোলে সে আর কখনো অন্ধকারে ভ্রমণ করে না।'

রণে কিছুতেই ভঙ্গ দেবেন না স্বামীজি। দেখে যাবেন শেষ পর্যন্ত।

'এখন অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করছি।' লিখছেন স্বামীজি : 'বারে বারে মনে হচ্ছিল এদেশ ছেড়ে চলে যাই। কিন্তু আবার মনে হচ্ছিল আমি একগুঁয়ে দানা, এত সহজেই হেরে যাব ? আমি কি ঈশ্বরের কাছ থেকে আদেশ পাই নি ? আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু তিনি তো সব দেখছেন। তাঁর চিরজাগ্রত চক্ষু তো এক মুহূর্তের জন্যেও অস্ত যাচ্ছে না। তবে আর ভয় কি, মরি-বাঁচি, আমার উদ্দেশ্য যেন না টলে।'

শোনা গেল বোস্টনে খরচ কম, সুতরাং বোস্টনের দিকেই যাত্রা করলেন স্বামীজি। আর সেই ট্রেনে মিস কেট স্যানবর্ণের সঙ্গে দেখা। বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা, অনিমেষ তাকিয়ে রইলেন স্বামীজির দিকে। এ কে প্রদীপ্ত-পুরুষ। আকাশের স্বর্ণসূর্য যেন নেমে এসেছে মাটিতে। আলাপ শুরু করলেন মহিলা।

'কতদূরে যাবে ?'

'বোস্টন।' বললেন স্বামীজি।

'উঠবে কোথায় ?'

'জানি না। শুনেছি বোস্টন সস্তার জায়গা, দেখি কোনো একটা সাদাসিদে হোটেল পাই কিনা।'

'আচ্ছা, তুমি তো ভারতীয় সন্ন্যাসী—তাই না ?'

সায় দিলেন স্বামীজি।

'আমেরিকায় এসেছ কেন ?' কৌতূহলে একাগ্র মিস স্যানবর্ণ।

'বেদান্ত প্রচার করতে। আসল উদ্দেশ্য ছিল শিকাগোতে ধর্মসভায় যোগ দেব, কিন্তু সভা আরম্ভ হতে এখনো আরো প্রায় তিন সপ্তাহ বাকি। এতটা সময় শিকাগোতে থাকি আমার এমন রসদ নেই। তাই চলেছি সস্তার জায়গার উদ্দেশে।'

'তুমি আমার ওখানে যাবে ? আমার অতিথি হবে ?' মিস স্যানবর্ণ আগ্রহে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

অবন্ধু বিদেশে এ কার স্নেহস্বর ! এ কার হাত বাড়ানো !

'তুমি থাকো কোথায় ?' কৃতজ্ঞ চোখে মহিলার করুণামাখানো নীল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন স্বামীজি।

'বোস্টনের কাছে এক গ্রামে মাসাচুসেটস-এ আমি থাকি।' বললেন মিস স্যানবর্ণ : 'আমার কুটিরের নাম 'ব্রীজি মেডোজ'—হাওয়াখাওয়া মাঠ। বাড়ির চারদিকে পাইন আর রুপোলি বার্চ, দেওয়ালবাওয়া আঙুরের লতা। পদ্মফুলে ভরা দিঘি, আর কাছেই দুটো ঝর্ণা, তাদের ধারে ধারে ফরগেট-মি-নট ফুটে আছে। যাবে তুমি ?'

'যাব।'

মিস স্যানবর্ণের বেশ সচ্ছল অবস্থা, প্রসন্ন আতিথেয়তায় গ্রহণ করলেন স্বামীজিকে। রোজ এক পাউন্ড করে খরচ বেঁচে যেতে লাগল স্বামীজির। কিন্তু স্যানবর্ণের লাভ কি ? বন্ধুমহলে একটি ভারতীয় কিউরিয়ো দেখিয়ে প্রতিপত্তি বাড়াচ্ছেন। দেখ দেখ কি অদ্ভুত পোশাক। মাথায় একটা কাপড়ের স্তূপ তারপরে আবার একটা পুচ্ছ ঝুলছে। আর গায়ে এই লম্বা ঢিলে বালিশের ওড় দেখেছ, একটা গোটা মানুষই আস্ত খোলের মধ্যে ! যে দেখে সেই হাঁ করে থাকে। রাস্তায় বেরুলেই টিটকিরি দেয়। উপায় নেই, এ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে মুখ বুজে। সমস্ত উদ্ধত নিবুদ্ধিতাকে বিগলিত করব, সমস্ত বিদ্রূপকে নিয়ে যাব অমিশ্র স্তুতিতে—তবেই তো আমি বিবেকানন্দ।

একদিন দু ঘোড়ার গাড়িতে করে মিস স্যানবর্ণ স্বামীজিকে নিয়ে বেরুলেন রাস্তায়। সাধককে কে চিনতে পারবে, ভাবল ভারতের কোনো রাজারাজড়া চলেছেন বেড়াতে। খবরের কাগজে বেরুল ভারতবর্ষের এক রাজা এসেছে স্যানবর্ণের কুটিরে। তার যেমন রূপ তেমন শোভা। সর্বোপরি তার বিচিত্র বেশ।

শুধু পোশাক দেখবার জন্যেই কাতার দিয়ে লোক দাঁড়ায় রাস্তায়। স্বামীজি ঠিক করলেন, সাধারণ চালচলনে চলবেন। গেরুয়া, কালো লম্বা একটা কোট তৈরি করে নিতে হবে। যদি সভায় গিয়ে দাঁড়াতে হয় বক্তৃতা দিতে তখন পরব আমার রাজবেশ—আলখাল্লা আর পাগড়ি। এই এখানকার মেয়েদের পরামর্শ। আর পোশাকব্যাপারে মেয়েরাই সর্বময়ী কর্ত্রী এখানে। কিন্তু চলনসই একটা পোশাক করতে তিনশো টাকা খরচ। হাতে মোটে

ষাট পাউণ্ড অবশিষ্ট। যা থাকে অদৃষ্টে, বোস্টনে গিয়ে পোশাকের অর্ডার দিলেন স্বামীজি। কিছু টাকা পাঠাবার কথা লিখলেন আলাসিংগাকে।

'যদি নাও পারো, আমি ছাড়ব না, আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখব। আমি যদি এখানে রোগে শীতে বা অনাহারে মরে যাই, তোমরা আছ, তোমরাই এই ব্রত নিয়ে উঠে পড়ে লাগবে। কি ব্রত? শুধু পবিত্রতা সরলতা আর বিশ্বাস। অগ্নিময় বিশ্বাস। রোম একদিনে নির্মিত হয়নি। প্রভু আমাদের নেতা, জয় দাও প্রভুর। আমরা জ্যোতির তনয়, জয় দাও জ্যোতির্ময়ের। তুচ্ছ জীবন তুচ্ছ মরণ তুচ্ছ ক্ষুধা তুচ্ছ শীত। শুধু অগ্রসর হও। কে পড়ল চেয়ে দেখো না। একজন পড়বে তো আরেকজন তার জায়গা নেবে। বন্ধ হবে না অগ্রগতি।'

রমাবাঈ হিন্দু মেয়ে, খৃস্টান হয়েছে। আমেরিকায় ঘুরে ঘুরে মেয়েদের ক্লাব খুলছে। হিন্দু বালিকাবিধবাদের অবর্ণনীয় দুর্দশা, তারই প্রতিকারের জন্যে ঐসব ক্লাবের সাহায্যে চাঁদা তুলছে অজস্র। দুর্দশা, তাতে সন্দেহ কি। তাই বলে, ধর্মান্তর গ্রহণ করেছ বলে দেশের বিধবাদের তুমি হেনস্তা করবে? যা নয় তাই বলে দেখাবে। বোস্টনে একটা রমাবাঈ-সার্কাল ছিল, স্বামীজি সেখানে বক্তৃতা দিতে গেলেন। আমেরিকায় সেই তাঁর প্রথম বক্তৃতা। বিষয়, ভারতীয় নারী—তথা বালবিধবা। আমেরিকায় মেয়েরা যারা শুনতে এসেছিল তারা থমকে গেল। ভারতে নারীত্ব স্ত্রীত্ব নয়—ভারতে নারীত্ব মাতৃত্ব। এমন সব শুভ্র পবিত্র উজ্জ্বল কথা বললেন স্বামীজি যা রমাবাঈ বলেনি। এমন ছবি তুলে ধরলেন যা কলঙ্কের ঊর্ধ্বে চন্দ্রিকার মত।

তারপর একদিন মিস স্যানবর্ণ স্বামীজিকে নিয়ে গেলেন শেরবর্ণ মহিলা জেলখানায়। মাথায় হলদে পাগড়ি গায়ে জ্বলন্ত গেরুয়া, বিষাদধূসর বন্দীশালায় সর্বকাল-প্রসাদ বিবস্বান সূর্যের মত আবির্ভূত হলেন স্বামীজি। সর্ববন্ধনবিমোচন ও সর্বব্যাধিনির্মুক্তির আশ্বাস নিয়ে কয়েদীর দল বহুমঙ্গল সন্ন্যাসীকে দেখে উল্লাস করে উঠল। তিনি যেন রুগ্নের আরোগ্য—দরিদ্রের বৃহৎনিধি। সেখানেও ভারতীয় নারীর জীবনযাত্রা নিয়ে বক্তৃতা করলেন স্বামীজি।

দণ্ড যে প্রতিশোধের জন্যে নয় সংশোধনের জন্যে এই নতুন তত্ত্ব দেখলেন এই জেলখানায়। যারা পাপী আর পতিত তাদেরকে ঠেলে ফেলে দেবার জন্যে নয় তাদের টেনে তুলে নেবার জন্যেই এই আশ্চর্য কর্মমন্দির। তারা যে পশু নয় ক্রীতদাস নয় গৃহহীন ভিক্ষুক নয় এই বিশ্বাসে তারা বলীয়ান।

'যখন ভারতবর্ষের দরিদ্র ও পতিতের কথা ভাবি', লিখছেন স্বামীজি, 'তখন ব্যথায় বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়। তাদের দাঁড়াবার জায়গা নেই, ওঠবার উপায় নেই, রাস্তা নেই পালাবার। তারা ডুবে যাচ্ছে দিন দিন। তারাও যে মানুষ এ কথাটাই তাদের কাছ থেকে গোপন রাখা হচ্ছে প্রাণপণে। হিন্দুধর্মের দোষ কি। হিন্দুধর্ম তো শেখাচ্ছে যেখানে যত প্রাণী সবাই তোমার আত্মার প্রতিরূপ মাত্র। দোষ ধর্মের নয়, দোষ হৃদয়ের অভাব। প্রভু এসেছিলেন বুদ্ধ হয়ে, গরিবের জন্যে দুঃখীর জন্যে পাপীর জন্যে কত কেঁদে গেলেন, কত শেখালেন কাঁদতে, কেউ তাঁর কথায় কান দিলে না। কিন্তু নিরাশ হয়ো না। প্রভু আবার আমাদের ডেকেছেন, কোমর বাঁধো, সমুচ্চ পতাকা তুলে নাও দৃঢ়করে।'

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক সাহিত্যের ডক্টর, অধ্যাপক জন হেনরি রাইট শুনতে

পেয়েছেন স্বামীজির কথা। স্যানবর্ণদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা অনেক দিনের, মিস কেটই পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিন্তু কী বৃহত্তেজা ব্যক্তিত্ব স্বামীজির, কথা কিছুতেই শেষ হতে চায় না। রাইট ভাবলেন একদিন তাঁর নিজের বাড়িতে স্বামীজিকে নিয়ে গেলে কেমন হয়।

যে কাছে এসে দেখে, কথা কয়, সেই জয় গায়। কেট স্যানবর্ণের খুড়তুতো ভাই ফ্র্যাঙ্কলিন বেঞ্জামিন - তারও কানে উঠেছে এই অদ্ভুতদর্শন হিন্দু সাধুর কথা। বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিতে চাইছিল কিন্তু কাছে বসে কথা কইতে এসেই মজে গেল। যে সে লোক নয় ফ্র্যাঙ্কলিন, সংবাদপত্রী, দার্শনিক, সমাজসেবক। ধরে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে, বোস্টনে।

রাইট এসেছেন বোস্টনে, স্বামীজির খোঁজে। কোথাও দুজনে বেরিয়ে গিয়েছে হয়তো, ধরতে পেলেন না। চিঠি লিখে রেখে গেলেন . স্বামীজি, যদি দয়া করে আসেন আমার ওখানে, সমুদ্রের ধারে আনিসকোয়াম গ্রামে, যদি আমাদের সঙ্গে কাটান একটা উইক-এণ্ড।

এক শুক্রবার এসে হাজির হলেন স্বামীজি। গৈরিকের সৈনিক, দিব্যদীপ্তিতে সহস্রাংশু। যেন স্বপ্নের মূর্তিতে জাগ্রত সত্য এসে দাঁড়ালেন। সমস্ত গাঁ-শহর আলো হয়ে গেল। হুল্লোড় পড়ে গেল চারদিকে। বাড়ি-ঘর-হোটেল-দোকান ভেঙে পড়ল দলে দলে। ত্রিশ বছরের যুবক, দেখ কি মহিমা তার আকৃতিতে। দেখ কি গৌরবে বহন করছে তার দেহ। দেহ তো নয় ঊর্ধ্ব-উচ্ছ্রিত স্তব। অব্যাহতবল বিগ্রহ। বিপুলাংসে, মহাবাহু, কম্বুগ্রীব, বিশালাক্ষ। স্নিগ্ধবর্ণ, সর্বশুভলক্ষণ, নিত্য-নির্মলাত্মা। চলো দেখবে চলো। আছে কোথায়? হোটেলে-মেসে-নয়, গাছতলায় নয়, ডক্টর রাইটের বাড়িতে। পণ্ডিত চিনেছে এবার পণ্ডিতকে। সারাক্ষণ কি কথা কইছে হে? শুধু ধর্মের কথা। প্রতি নিশ্বাসে প্রত্যেকটি চক্ষুর পলকে ধর্ম। ধর্মই আলো ধর্মই বাতাস ধর্মই জল ধর্মই খাদ্য।

উনি বলছেন আর সবাই তাই শুনছে স্থির হয়ে? সায় দিচ্ছে? তর্ক করছে না? অনর্গল তর্ক করছে। কিন্তু সাধ্য নেই তুমি পরাস্ত কর। পরাস্ত করা দূরের কথা সাধ্য নেই তাঁকে তুমি ফেল বেকায়দায়। সেই শুদ্ধ জ্ঞানের দক্ষিণামূর্তির কাছে সমস্ত তর্ক স্তব্ধ। তুমিও বসে পড়ো সামনে। তারপরে শোনো উৎকর্ণ হয়ে।

একদিন রাইট স্বামীজিকে গির্জেতে নিয়ে গেলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই শুনল তাঁর দীপ্তবাণী। যাকে সবাই মূর্তিপূজক বলে চেয়েছিল দূরে রাখতে, তাকেই এখন হৃদয়ে এনে বসাল ধ্যানের মূর্তি করে।

'জগতের সমগ্র জাতিকে বলতে হবে বেদের ভাষায়, তোমাদের বাদবিসম্বাদ বৃথা। তোমরা যে ঈশ্বরকে প্রচার করতে চাও তাকে কি দেখেছ কখনো? যদি না দেখে থাকো, প্রচার নিরর্থক, তুমি কি বলছ তাই তোমার জানা নেই। আর যদি তুমি ঈশ্বরকে দেখে থাকো, আর কিসের তবে বিবাদবচসা? তোমার মুখ তখন অন্য শ্রী ধারণ করবে। জীবনে তাই শ্রীমান হয়ে ওঠো। এক ঋষি তার পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্যে পাঠিয়েছিল গুরুগৃহে। শিক্ষা সমাপ্ত করে পুত্র যখন ফিরে এল ঋষি জিগগেস করলে, কি শিখলে? নানা বিদ্যা নানা বাক্য নানা বেদ। কিছু হয়নি। আবার যাও গুরুগৃহে। আবার যখন ফিরল আবার সেই বাগাড়ম্বরের স্পর্ধা। এবারও হয়নি, আরেকবার চেষ্টা করো।

তৃতীয়বার যখন ফিরল পুত্র, তখন তার আর কথা নেই, তখন তার শুধু বিভা, তার শুধু শ্রী। তখন ঋষি বললেন, বৎস, তোমার মুখ আজ উদ্ভাসিত দেখছি, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। যখন কেউ ঈশ্বরকে জানবে তখন তার মুখশ্রী তার স্বর তার দৃষ্টি তার ভঙ্গি তার সমগ্র আকৃতিই বদলে যাবে। তখন সে মানুষের মহামঙ্গলস্বরূপ হয়ে উঠবে। তখনই সে ঋষি নামের অধিকারী হবে। ঋষিত্বলাভই হিন্দুর মুক্তি।

এ কি সেই হিন্দু নয় ? এ কি নয় সেই ঋষি ?

৪৭

'ভারতবর্ষকে তুলতে হবে, গরিবদের খাওয়াতে হবে পেট ভরে, শিক্ষার বিস্তার করতে হবে দিকে-দিকে আর পুরোতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হবে যেন তারা ঘুরপাক খেতে-খেতে আটলান্টিক মহাসাগরে ছিটকে পড়ে—তা তিনি ব্রাহ্মণই হোন, সন্ন্যেসীই হোন, যিনিই হোন।' আলাসিঙ্গাকে লিখছেন স্বামীজি : 'সামাজিক আচার একবিন্দুও যাতে না থাকে তাই দেখতে হবে। প্রত্যেকে যাতে আরো ভালো করে খেতে পায় আর সুবিধে পায় উন্নতি করতে ... । আমাদের নির্বোধ যুবকেরা ইংরেজের থেকে ক্ষমতা পাবার জন্যে সভাসমিতি করছে, ইংরেজ হাসছে মুখ লুকিয়ে। যে অন্যকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয় সে কি করে স্বাধীন হবার যোগ্য ? ধরো ইংরেজ তোমাদের হাতে শক্তি ছেড়ে দিলেন, তাতে হবে কি ? আর কেউ এসে শক্তি কেড়ে নেবে। দাসেরা শক্তি চায় অন্যকে দাস করে রাখবার জন্যে।'

আর ইংরেজ ?

'ভারতবর্ষে কী রেখে যাবে ইংরেজ ?' বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বামীজি : 'হিন্দুরাজারা রেখে গিয়েছে মন্দির, মুসলমান রাজারা অট্টালিকা, আর ইংরেজ ? ইংরেজ রেখে যাবে ভাঙা ব্র্যান্ডির বোতলের স্তূপ। কী করেছে ইংরেজ ? নিজের ফুর্তির জন্যে আমাদের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত শুষে নিয়েছে। শত হাতে আমাদের ভাণ্ডার লুট করে নিয়েছে যাতে আমরা নিরন্নের দল পথে-পথে ঘুরে বেড়াই। তাদের পশুশক্তির নির্লজ্জ প্রতীক হচ্ছে বুট আর বুলেট। একটা গোটা দেশের মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছে ভাষা, দেহ থেকে খসিয়ে নিয়েছে মেরুদণ্ড। কিন্তু নিরাশ হবার কিছু নেই। আসছে জ্বলন্ত প্রতিশোধ। সে জ্বলন্ত প্রতিশোধ আর কেউ নয়—সেই জ্বলন্ত প্রতিশোধ চীন। চীনের জন-জলপ্লাবন।'

'আমাদের এই দুর্দশা কেন ?' আবার বলছেন স্বামীজি : 'আমরা আমাদেরই দেশবাসীকে হেয় বলে অপজাত বলে অস্পৃশ্য বলে নির্যাতন করেছি—সেই হেতু। যেখানে অত্যাচার, জানবে, সেখানেই প্রতিশোধ। স্তূপীভূত মেঘের মধ্যে বজ্রের আয়োজন।'

রাইট বললেন, 'তুমি যাও এবার শিকাগো—' রাইটের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ও দৃঢ়।

রাইটের মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকালেন স্বামীজি। শিকাগো ! সে আশা তো তিনি কবে ছেড়ে দিয়েছেন। 'শিকাগো ! সে তো অনেক দূর !'

না মোটেই দূর নয়। আমিই সব ব্যবস্থা করে দেব।'

'আপনি ব্যবস্থা করে দেবেন ?' অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন স্বামীজি : 'আমার ঢাল নেই তরোয়াল নেই, চাল নেই চুলো নেই—আমাকে পাত্তা দেবে না।'

'আপনাকে পাত্তা দেবে না ?' রুখে উঠলেন প্রফেসর : 'আপনার জন্যেই তো ধর্মসভা, আপনিই তো সেই সভার প্রধান ব্যক্তি, প্রথম ব্যক্তি।'

'বলেন কি ! আমি যখন সেখানে গেলাম আমাকে বলল, আপনার সার্টিফিকেট কই ? পরিচয়পত্র কই ?'

'বললে ?' প্রফেসর গর্জন করে উঠলেন : 'তা হলে যেন ওরা সূর্যকে জিগগেস করে, তুমি যে আকাশে আলো দেবে, তোমাকে কে চেনে, কোথায় তোমার বাড়ি-ঘর, কবে আর কোথায় এর আগে আলো দিয়েছ, তোমার সম্বন্ধে কার কি অভিমত, এত বড় আকাশে আলো দিতে পারবে তার ভরসা কি ! সূর্য কারু প্রশ্নের তোয়াক্কা করে না, ধার ধারে না কোনো অধিকারের। সে নিজের ঔজ্জ্বল্যে পরিচিত। স্বামীজি, তুমি সেই সূর্যের মত স্বপ্রকাশ।'

'ডেলিগেটের টিকেট দেবে কে আমাকে ?'

'প্রতিনিধি নির্বাচনের কমিটির যে চেয়ারম্যান সে আমার বন্ধু। তাকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুমি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করবে।' গম্ভীরমুখে বললেন প্রফেসর রাইট।

এ সব কি গল্পকথা শুনছি নাকি ! স্বামীজি উৎসাহে প্রতপ্ত হতে লাগলেন। স্মরণ করতে লাগলেন ঠাকুরকে।

'তুই দেখে নিস।' দেশে থাকতে বলেছিলেন তুরীয়ানন্দকে : 'এই আমার জন্যেই শিকাগোতে ধর্মসভা হচ্ছে, শুধু আমি সেখানে বক্তৃতা দেব বলে। তুই দেখে নিস হরি ভাই।'

'কিছুতেই ভয় পেয়ো না', লিখছেন রামকৃষ্ণানন্দকে : 'যতদিন তিনি আমার মাথায় হাত রাখছেন, ততদিন কি কারুর আমাকে দাবাবার জো আছে ? ভবেয়ুঃ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণাঃ, প্রাণ কণ্ঠাগত হোক, তবু ভয় পাবে না। সিংহবিক্রম অথচ কুসুমকোমলতার সঙ্গে কাজ করবে।' আরো লিখছেন : 'তিনি কি শুধু ভারতের ঠাকুর ? ঐ সংকীর্ণ ভাবের থেকেই অধঃপতন হয়েছে। ঐ সংকীর্ণ ভাবের বিনাশ না হলে কল্যাণ অসম্ভব। আমার যদি টাকা থাকত তোমাদের প্রত্যেককে পৃথিবীপর্যটনে পাঠাতাম। কোণ থেকে না বেরুলে কোনো বড় ভাব হৃদয়ে আসে না। তিনিই কাণ্ডারী, ভয় কি ?'

কমিটির চেয়ারম্যানকে চিঠি লিখলেন রাইট। লিখলেন, 'যাঁকে পাঠাচ্ছি তাঁর একার বিদ্যা আমাদের দেশের প্রাজ্ঞ পণ্ডিতদের একত্রিত বিদ্যার চেয়ে বেশি। ধারে তো বটেই, ভারেও।'

'তবে একটু ইংরেজি ভাষাটা দোরস্ত করতে হবে।' স্বামীজি লিখছেন ব্রহ্মানন্দকে : 'অর্থাৎ ফলকথা এই যে, এদের দেশের বাঘভাল্লুকে-পাদ্রি পণ্ডিতদের মুখ থেকে রুটি ছিনিয়ে নিয়ে খেতে হবে। অর্থাৎ বিদ্যার জোরে এদের দাবিয়ে দিতে হবে, নইলে ফু করে উড়িয়ে দেবে দেখো। এরা না বোঝে সাধু, না বোঝে সন্ন্যাসী, না বোঝে ত্যাগ-বৈরাগ্য। বোঝে বিদ্যার তোড়, বক্তৃতার ধুম আর মহাউদ্যোগ। জগদম্বার ইচ্ছায় সকলি সম্ভব।'

'আপনি তো পাঠাচ্ছেন আমাকে শিকাগোতে—' ভাবতেও স্বামীজি রোমাঞ্চিত হচ্ছেন, বলছেন, 'কিন্তু আমার ট্রেনের টিকিট কেনবার পয়সা কই ?'

'আমি দেব।' বললেন রাইট।

'আপনি দেবেন ?'

'হ্যাঁ, মনে করো ঈশ্বরই দিচ্ছেন করুণা করে।' রাইটের দুচোখ চকচক করে উঠল।

'কিন্তু সেখানে থাকব কোথায় ? খাব কি ?'

'তাও পুরোপুরি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।'

সন্দেহ কি, ঠাকুরের করুণা। ঠাকুরের অমিত মহিমা, অমোঘ মহিমা।

কিন্তু শিকাগো থেকে উত্তর আসতে দেরি আছে। সভা তো সেই এগারোই সেপ্টেম্বর। এর মধ্যে ঘুরে আসি স্যালেম। মিসেস টানাট উড্স সেখানে নেমন্তন্ন করেছেন বক্তৃতা দিতে। "থট য়্যাণ্ড ওয়াক" ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সভ্যা, মিসেস উডস্ আবার শিশু-সাহিত্যেরও রচয়িত্রী। একেবারে তাঁর বাড়িতে এনে আশ্রয় দিলেন স্বামীজিকে। একটি নিত্যানন্দবর্ধন শিশুকে।

"থট য়্যাণ্ড ওয়াক" ক্লাবেই বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয় ভারতবর্ষ, তার ধর্ম ও রীতিনীতি। কে বক্তৃতা দেবে ? নাম কি ? কেউ বলে বিবেকানন্দ, কেউ বিবিক্তানন্দ, কেউ বা বিবিক্কানন্দ। করে কি ? জানো না বুঝি ? ভারতবর্ষের কোন এক রাজা। সভায় আসবে তার স্বদেশে তৈরি রাজকীয় পোশাকে। ভারি মজা। দেখবে চলো। শুনবে চলো।

এ কি ! রাজা কোথায় ! এ যে রাজরাজেশ্বর ! এ যে নববেশে বুদ্ধ, যীশুখৃস্টের আবির্ভাব। আর কি কণ্ঠস্বর ! যেন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে বিশাল সমুদ্র সম্ভাষণ করে উঠেছে। সে কণ্ঠস্বরে সারল্য ও আন্তরিকতার জাদু, পবিত্রতার অমৃতস্পর্শ। কী বলছে ? নতুন কথা বলছে। পশ্চিম কখনো শোনেনি এমন কথা। বলছে, ভালোর জন্যেই ভালো কাজ করো, পুরস্কারের জন্যে নয়। আর কী ভালো কাজ করেছি তা যেন না বলে বেড়াও। নিজের আমি-টাকে হাম-বড়া ভাবটাকে জলাঞ্জলি দাও। সোজা কথা, ভালো কাজই ঈশ্বরের কাজ। এই ঈশ্বরের কাজেই নিযুক্ত থাকো, নিমগ্ন থাকো। সবাই অনুভব করল, বক্তার উপস্থিতিটাই ঈশ্বরকর্মের উদ্দীপনা। পরের কথা ভাবা, পরের হিতের জন্যে কাজ করাই ঈশ্বরকর্ম।

পরোপকারে কার উপকার ? নিজের উপকার। বলছেন বিবেকানন্দ। উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে, দু'টো পয়সা নে রে, বলে গরিবকে তা দিও না, বরং তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও যে সে গরিব হওয়াতে তাকে সাহায্য করে তুমি নিজের উপকার করতে পারছ। যে গ্রহণ করে সে ধন্য হয় না, যে দাতা সেই ধন্য। তুমি যে তোমার দয়াশক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে পবিত্র করতে পারছ, কৃতার্থ করতে পারছ তাতে নিজেই তুমি কৃতজ্ঞ হও। যদি দুঃস্থ না থাকত তবে তোমার এই আশ্চর্য শক্তিটাকে দেখাতে কি করে ? কি করে নিজের মধ্যে পেতে তুমি তোমার অপরিমেয়তার স্বাদ ?

সুতারাং জগতের উপকার করব এই অজ্ঞানের কথা ছাড়ো। জগৎ তোমার বা আমার সাহায্যের জন্যে বসে নেই। আমাদের কাজ করতে হবে, সর্বদাই পরোপকার, যেহেতু তা আমাদেরই সৌভাগ্যস্বরূপ। শুধু এই উপায়েই আমরা পূর্ণ হতে পারি। কোনো গরিবই আমাদের এক পয়সা ধারে না, আমরাই তার সব ধারি, কারণ সে আমাদের দয়াশক্তি তার

উপর ব্যবহার করতে দিচ্ছে। এই সুযোগই আমাদের সৌভাগ্য। অমুক অমুক লোককে উপকার করেছি, সাহায্য করেছি এই চিন্তাটাই ভুল। এ বৃথা চিন্তা, আর বৃথা চিন্তাতেই কষ্ট। মনে মনে ভাবি, একে যখন সাহায্য করেছি সে অন্তত একটা ধন্যবাদ দিক, কৃতজ্ঞতা জানাক, না দিলে না জানালেই অশান্তি। কেন প্রতিদান আশা করব? যাকে তুমি সাহায্য করছ, বলছেন বিবেকানন্দ, তাকে তুমি ঈশ্বরবুদ্ধি করো। যদি সে তোমার ঈশ্বর, তাকেই তুমি ধন্যবাদ দাও, তাকেই তুমি জানাও তোমার কৃতজ্ঞতা। তোমার সেই সাহায্যকার্যই ঈশ্বরের উপাসনা। পরের জন্যেই তুমি, এ বাণী ভারতবর্ষের। আর, চাচা, আপন বাঁচা, এ ধ্বনি পশ্চিমের।

'একটি ছেলে কাজ করে যা উপার্জন করেছিল তার কিছু অংশ তার মাকে এনে দিলে, ছেলেবেলার ইংরেজী নীতিশিক্ষার বইয়ে পড়েছিলাম তার প্রশংসা।' বলছেন স্বামীজি: 'এর মধ্যে প্রশংসার কি আছে, নীতিশিক্ষাই বা কি। পরে বুঝেছিলাম পশ্চিমে বাবা-মাকে খাওয়ানোই একটা বড় কথা, সাংঘাতিক কথা। আমাদের ভারতবর্ষে ছেলের ব্যবহার সম্বন্ধে কোনো দ্বৈধ নেই। সে তার রোজগারের সবটাই তার মাকে এনে দিত। এ মাকে উপকার নয়, নিজেকে উপকার।'

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যজ্ঞ করছে পঞ্চপাণ্ডব। বিরাট যজ্ঞ, এমনটি কেউ দেখেনি, চমকে-জমকে অভূতপূর্ব। উথলে উঠেছে দানসাগর—ধনরত্নের ছড়াছড়ি। সে যজ্ঞে এক অদ্ভুতদর্শন বেজি এসে উপস্থিত। তার গায়ের আধেক সোনা, আধেক পাঁশুটে। সে এসে বললে, এ কি, এই যজ্ঞ? ছি ছি এ একটা যজ্ঞই নয়।

বলো কি, এত যেখানে দান, দানের পর্বতস্তূপ, সে যজ্ঞ নয়?

না, যজ্ঞ দেখেছিলাম সেই এক গাঁয়ে, এক গরিব ব্রাহ্মণের কুটিরে। কুটিরে ব্রাহ্মণ আর তার স্ত্রী, তাদের ছেলে আর ছেলের বউ। ধর্মের উপদেশ দিয়ে যা ভিক্ষে পেত তাই দিয়েই ব্রাহ্মণ নির্বাহ করত জীবিকা। সে গাঁয়ে সেবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হল। লোকে খেতে পাচ্ছে না, শুকনো উপদেশ কে শোনে? অনাহারের মধ্যে এসে দাঁড়াল সেই দারিদ্রের পরিবার। পাঁচ-পাঁচ দিন ধরে সমানে সকলের উপবাস—এই বুঝি মৃত্যু এসে হানা দিল দুয়ারে। ছ দিনের দিন কিছু ছাতু যোগাড় করল ব্রাহ্মণ। ক মুষ্টি ছাতু, মনে হল বসুন্ধরার উজাড়করা ধন। সমান ভাগ করে বসেছে চারজনে, এমন সময় দরজায় ঘা পড়ল। কে? আমি অতিথি। অতিথি? তুমি নারায়ণ। ব্রাহ্মণ উঠে দরজা খুলে দিল। অতিথি বললে, আমি ক্ষুধার্ত, দীর্ঘ দশদিন ধরে উপবাসী, কিছু খেতে দাও আমাকে। ব্রাহ্মণ তার নিজের ভাগ তুলে দিল অতিথিকে। দু গ্রাসে সেই ভাগ নিঃশেষ করে অতিথি বললে, এটুকু খেয়ে আমার খিদে আরো বেড়ে গেল, আরো ভাগ দাও। এ কি সর্বনাশী ক্ষুধা! ব্রাহ্মণ চোখে অন্ধকার দেখল। ব্রাহ্মণী তখন স্বামীকে বললে, আমার ভাগও দাও এই পীড়িতকে। ব্রাহ্মণ প্রতিবাদ করে উঠল, বললে, না, তোমাকে বিপন্ন করতে পারব না। তখন স্ত্রী বললে, না, আমাকে স্ত্রীর কর্তব্য করতে দাও। স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামীর নারায়ণসেবায় সাহায্য করা। ব্রাহ্মণী দিয়ে দিল তার ছাতুর ভাগ। এবং এই ভাবে ছেলে আর ছেলের বউও তাদের ভাগ দিয়ে দিল অতিথিকে। তখন সর্বগ্রাস করে সেই অতিথি তৃপ্ত হল। সেই কুটিরে ঘরের মেঝেতে কিছু ছাতুর গুঁড়ো ছিল, আমি সেই মেঝেতে যখন এসে গড়াগড়ি দিলাম আমার আধেক শরীর সোনা হয়ে গেল। সেই থেকে আমি আরেকটা এমন যজ্ঞ খুঁজে বেড়াচ্ছি—যেখানে আমার শরীরের বাকি আধেকও সোনা হয়ে যাবে। সমগ্র জগৎ

ঘুরে বেড়াচ্ছি, আজও অমন আরেকটা যজ্ঞের দেখা পেলাম না। আমার দেহের বাকি আধেকটা পাঁশুটেই থেকে গেল—

কেন, এই যজ্ঞ ? এ কি একটা যজ্ঞ ? এটা একটা অহঙ্কারের রাজসূয়। এতে দান আছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু আত্মদান কই ? কই প্রচারবৈমুখ্য ?

আরেকটা বক্তৃতা দিলেন সালেমে। বিষয়, হিন্দুদের জাতিভেদ ; ভারতীয় নারীদের সামাজিক দুর্গতি ; ভারতবর্ষের নিদারুণ দারিদ্র্য। জাতিভেদ সামাজিক কর্মবিভাগ থেকে, ধর্ম থেকে নয়। আর নারীদের দুর্গতি তাদের আমরা শুধু দেবী বলে পুজো করেছি বলে, অন্তঃপুরের মন্দিরবেদীতে বন্দিনী রেখেছি বলে। কিন্তু এ সব দুর্গতি-দুর্দশার একদিন অবসান হবে, কিন্তু দারিদ্র্য ? এ নাগপাশের মোচন হবে কবে ? এ যে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ।

'বুদ্ধ থেকে রামমোহন রায় সকলেই এই ভুল করেছিলেন যে, জাতিভেদ ধর্মবিধান, তাই তাঁরা ধর্ম ও জাতি দুটোকেই ভাঙতে চেয়েছিলেন একসঙ্গে।' শিকাগো থেকে লিখছেন স্বামীজি : 'হিন্দু ধর্মনেতারা যাই বলুন, জাতি একটা সামাজিক বিধান মাত্র। এ দূর হতে পারে যদি লোকের সামাজিক স্বত্ববুদ্ধিকে জাগ্রত করা যায়। এখানে যে কেউ জন্মায় সে জানে সে একজন মানুষ। ভারতে যে কেউ জন্মায় সে জানে সে সমাজের একজন ক্রীতদাস মাত্র। স্বাধীনতাই উৎখাত করতে পারে এই মনোভাব। স্বাধীনতা হরণ করে নাও, অধোগতি ছাড়া আর কিছু নেই চতুর্দিকে। আধুনিক প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষেই উঠে যাচ্ছে জাতিভেদ। ব্রাহ্মণ জুতোব্যবসায়ী বা ব্রাহ্মণ শুঁড়ি দুর্লভ কি আজকাল ?'

আরো লিখছেন : 'হিন্দু যেন কখনো তার ধর্ম না ছাড়ে। ভারতের সকল সংস্কারক ভুল করে ধর্মকেই পৌরোহিত্যের সমস্ত অত্যাচার ও অবনতির জন্যে দায়ী করেছেন। তাই তাঁরা হিন্দুধর্মের অবিনশ্বর দুর্গকে ভাঙতে উদ্যত হলেন। ফল কী হল ? ফল হল তাঁরা সকলেই ব্যর্থ হলেন।'

পর্দা উঠে যাবে, নারীদের অশিক্ষাও দূরীভূত হবে একদিন। লিখছেন স্বামীজি : 'সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক কিন্তু এদেশের মেয়েদের মত মেয়ে কই ? যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু—যে দেবী সুকৃতী পুরুষের গৃহে স্বয়ং শ্রীরূপে বিরাজমান। চণ্ডীকথিত কোথায় আমাদের সেই গৃহশ্রী ? বাবাজী, শাক্ত শব্দের অর্থ জানো ? শাক্ত মানে মদভাণ্ড নয়, শাক্ত মানে যিনি সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। এদেশের পুরুষেরা তাই দেখে। মনু মহারাজ বলেছেন, যত্র নার্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যে গৃহে স্ত্রীলোক সম্মানিত সেই গৃহের উপরেই ঈশ্বর সুপ্রসন্ন। এখানে তাই এরা সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ হেয় অধম অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, নিরুদ্যম, দরিদ্র।

'আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র! তুষারের মত শুভ্র। পঁচিশ-তিরিশ বছরের কম কারু বিয়ে হয় না। আকাশে পাখির মত স্বাধীন। বাজার-হাট রোজকার দোকান, কলেজ, প্রোফেসর, সব কাজ করে—অথচ কি পবিত্র! স্কুল-কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়েছেলেদের পথ চলবার জো নেই। আবার মেয়ে এগারো বছরে বিয়ে না হলে খারাপ হয়ে যাবে! আমরা কি মানুষ বাবাজী ? মনু বলেছেন, কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। ছেলেদের মত মেয়েদেরও ত্রিশ বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করে বিদ্যাশিক্ষা

করতে হবে। কিন্তু আমরা কী করছি? মেয়েদের যদি উন্নত করতে পারি তবেই আমাদের আশা আছে। নইলে ঘুচবে না পশুজন্ম।'

কিন্তু তোমাদের সেই বর্বরপ্রথা সতীদাহ কী? সভার মধ্য থেকে প্রশ্ন করল কে একজন। সে-প্রথা উঠে গেছে। কিন্তু সে-প্রথার জন্ম স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অচ্ছেদ্য অনুরক্তি থেকে, কোনো একটা বর্বর অনুশাসন থেকে নয়। বিবাহে স্বামী-স্ত্রী এক ছিল, মৃত্যুতেও স্বামী-স্ত্রী এক—এই আদর্শই ধরতে চেয়েছিল সমাজে। কিন্তু সে যখন গেছে তখন তা নিয়ে আর কথা কেন?

কিন্তু তোমাদের পৌত্তলিকতা? আবার এক প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হয়।

আমরা কি পুতুলকে পুজো করি? আমরা পুজো করি প্রতিমাকে, ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়াকে। অনন্তকে ধরি কি করে যদি তার একটি অবয়ব না কল্পনা করি? তাই আমার সীমাবদ্ধ ঘটের শূন্যতাই মহাকাশের প্রতীকের কাজ করে! কিন্তু জিগগেস করি পৌত্তলিক কে নয়? বহু ভক্ত খৃস্টানকে জিগগেস করেছি, সত্যি করে বলো, উপাসনার সময় কী ভাবো? কেউ বলেছে চার্চ ভাবি, কেউ বলেছে ক্রুশ, কেউ বলেছে স্বয়ং যীশু। বুদ্ধ ঈশ্বর মানলেন না, কিন্তু নিজে ঈশ্বর হয়ে বসলেন। সাধারণ মানুষ মূর্তি ছাড়া ধরবে কাকে? অক্ষরের সাহায্য ছাড়া কার পাঠোদ্ধার করবে?

কিন্তু এত যে মিশনারি যাচ্ছে তোমাদের দেশে তারা করছে কী?

দয়া করে তাদের কথা আর বোলো না। তারা কি ধর্ম শেখাচ্ছে? তারা শুধু দলের খাতায় নাম বাড়াচ্ছে। দেশের ধর্ম দিয়ে কী হবে যদি দেশের আহারের না সংস্থান হয়? পেটে খিদে রেখে ঈশ্বরের নাম চলে না। এখন থেকে আর মিশনারি পাঠিও না, এঞ্জিনিয়র পাঠিও। ধর্মবিস্তারে কি হবে, ধর্মবিস্তারের সুবিধে করে দাও। কলকারখানা বসাও, জীবিকার ক্ষেত্রে ডাক দাও উপবাসীকে। তা যদি না পারো পরের দেশে গিয়ে ধর্মের ধ্বজা আর তুলতে চেও না। সমস্ত কুসংস্কার দূর হবে একদিন দেশ থেকে, সমস্ত অনাচার, সমস্ত বিকৃতি-বিচ্যুতি। কিন্তু এই পর্বতভার দারিদ্র্যের উচ্ছেদ হবে কি করে? শ্মশানে দগ্ধ অঙ্গারের অক্ষরে কবে লেখা হবে সুশ্যামলের কবিতা।

শিকাগো থেকে লিখছেন স্বামীজি: 'গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় দু টাকা। সকলে চেচাচ্ছেন আমরা বড় গরিব, কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করবার কটা প্রতিষ্ঠান আছে? লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্যে কজনের প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান, আমরা কি মানুষ? ঐ যে পশুবৎ হাড়ি-ডোম তোমার বাড়ির চারদিকে, তাদের উন্নতির জন্যে, তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্যে তোমরা কী করেছ বলতে পারো? তোমরা তাঁদের ছোঁও না, শুধু দূর-দূর কর। আমরা কি মানুষ? এখন ধর্ম কোথায়? এখন খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না। মনে রাখবে, দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবন। আর আমাদের কাজের মূল [illegible] কারো ধর্মে একবিন্দু আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতি। আমাদের আধুনিক সংস্কারকেরা বিধবাবিবাহ নিয়েই বেশী ব্যস্ত। সকল সংস্কারকর্মেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাদের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোনো জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে না। জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর। তার উন্নতি করতে পারো?'

দুজন পাদ্রী, ডক্টর গার্ডনার, [illegible] প্রতি [illegible]ই স্বামীজিকে বিরক্ত করছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে চাইছে বিড়ম্বিত করতে। [illegible] পরাস্ত হবার পাত্র

29/3/42

স্বামীজি নন। শান্তভাবে দৃঢ়কণ্ঠে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। তবু তারা নিরস্ত হচ্ছে না, গির্জেয় গিয়ে বেদীর থেকে অপভাষণ করছে। তার চেয়ে প্রকাশ্য সভায় পাদ্রীদের সঙ্গে হোক একটা সাক্ষাৎকার। টানাট উডস স্যালেমের সমস্ত পাদ্রীবংশকে নিমন্ত্রণ করে আনলেন, শোনো সনাতন ভারতবর্ষের নবীন প্রাণের প্রতীক বীরোত্তম সন্ন্যাসীকে, বোঝো যদি বুঝতে পারো হিন্দুধর্মের উদার তত্ত্ব। সেই সভায় পাদ্রীর দল তীব্র কদর্য ভাষায় আক্রমণ করল স্বামীজিকে, যত পারল বর্ষণ করতে লাগল কটূক্তি, কিন্তু কি আশ্চর্য, স্বামীজির শান্তিতে বা দৃঢ়তায় এতটুকুও রেখা পড়ল না। তাঁর ভদ্রতা ও প্রসন্নতা অক্ষুণ্ণ রইল। তাঁর বক্তব্য তাঁর প্রতিপাদন থেকে তিনি এতটুকু ভ্রষ্ট হলেন না। নিরপেক্ষর দল মুগ্ধ হয়ে গেল স্বামীজির ব্যবহারে—মৌনই যে মহান উত্তর তার উচ্চারণে।

পাদ্রীদের সঙ্গে এই স্বামীজির প্রথম সংঘর্ষ। পরে আরো আছে।

কিন্তু স্বামীজি বিগতভীঃ, ব্রাহ্ম-শ্রীসম্পন্ন। দিবাকর-কখনো পূর্বদিক ত্যাগ করে না, স্বামীজিও তেমনি ত্যাগ করেন না তাঁর ধর্মকে। ধর্মই একমাত্র শ্রেয়, ক্ষমাই একমাত্র শান্তি, বিদ্যাই একমাত্র তৃপ্তি, আর অহিংসাই একমাত্র সুখনিদান।

লিখছেন স্বামীজি: 'ভ্রাতৃগণ, কোনো ভালো কাজই বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় না। শুধু যারা শেষ পর্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেগে থাকে তারাই কৃতকার্য হয়। সনাতন হিন্দুধর্মের জয় হোক। মিথ্যাবাদী ও পাষণ্ডদের পরাভব হোক। ওঠো, আমরা নিশ্চিত জয়ী হব।'

১৮

শিকাগোর ট্রেন ধরলেন স্বামীজি। রাইটের ব্যবস্থানুযায়ী চিঠি এসেছে স্বামীজির কাছে। কোথায় গিয়ে উঠতে হবে থাকতে হবে তারও নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে রাইট। নিজের পয়সায় টিকিটও কিনে দিয়েছে একখানা। এ সব কী করে হয়? কার কৃপায়?

'জীবন ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নমাত্র, যৌবন ও সৌন্দর্য বসে থাকে না—' লিখছেন স্বামীজি: 'দিবারাত্র বলো, তুমি আমার পিতা, মাতা, স্বামী, দয়িত, প্রভু, ঈশ্বর—তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না, আর কিছুই না, আর কিছুই না। তুমি আমাতে, আমি তোমাতে—আমি তুমি, তুমি আমি। ধন চলে যায়, সৌন্দর্য চলে যায়, শক্তি চলে যায়, জীবন নিবে যায় এক ফুঁয়ে, কিন্তু প্রভু চিরদিন থাকেন, প্রেমও অম্লান-অক্ষয়। যদি দেহকে সুস্থ রাখতে পারায় কিছু গৌরব থাকে তবে দেহের অসুখের সঙ্গে আত্মাতে অসুখের ভাব আসতে না দেওয়ায় আর গৌরব। জড়ের সম্পর্ক না রাখাই একমাত্র প্রমাণ যে তুমি জড় নও। সুতরাং ঈশ্বরে লেগে থাকো, দেহে বা অন্য কোথায় কি হচ্ছে কে গ্রাহ্য করে? যখন বিপদ আর দুঃখ এসে বিচিত্র ভয় দেখাতে শুরু করে তখন বলো, হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়; যখন মৃত্যুর ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে এসে পড়েছ তখনো বলো, হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়। তুমি তো এখানেই, আমার সঙ্গেই আছ, আমি তোমাকে দেখছি, তোমাকে অনুভব করছি। আমি এই জগতের নই, আমি তোমার, তুমি আমাকে ত্যাগ কোরো না। হীরার খনি ছেড়ে কাচখণ্ডের অন্বেষণে নিয়ে যেও না।

এই জীবন একটা মস্ত সুযোগ, তোমরা কি এই সুযোগ অবহেলা করে বসে থাকবে ? যিনি সকল আনন্দের প্রস্রবণ তাকে খুঁজবে না ?'

যদি ধর্মসভায় ঢুকতে পাই, কী না জানি বলা হবে সেখানে ! কোনো বক্তৃতাই তৈরি নেই, কিছু লিখে নিয়ে আসিনি সঙ্গে করে। তিনি যেমন বলান তেমনি বলব।

শিকাগোতে রওনা হবার আগে স্বামীজি সালেম থেকে গিয়েছিলেন সারাটোগায়। সেখানে আমেরিকান সোশ্যাল সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে ডেকেছিল বক্তৃতা দিতে। সে প্রতিষ্ঠানে ধর্ম-আলোচনা চলবে না, সামাজিক সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে বলতে হবে। তাই সই। যে বিষয় চাও সেই বিষয়ে বলব। সর্ব ব্যাপারে আমি প্রস্তুত। স্বামীজিকে প্রথম বিষয় দেওয়া হল, ভারতে মুসলমানী শাসন, দ্বিতীয় বিষয়, ভারতে রৌপ্যের ব্যবহার ; তৃতীয়, ভারতীয়দের রীতি-নীতি সংস্কার-বিশ্বাস। সমস্ত বিষয় নখাগ্রে, নখাগ্রে শুধু নয় জিহ্বাগ্রে। যে শোনে সে শুধু শোনেই না, দেখে। বিষয় যাই হোক না কেন দেখে এক বিষয়াতীত বিস্ময়। লৌকিক ছাড়া কিছু চলে না সেই সমাবেশে কিন্তু এ'র আবির্ভাবই যেন অলৌকিকের স্বাক্ষর।

ট্রেনে এক গণ্যমান্যের সঙ্গে দেখা। খুব একজন বড় ব্যবসাদার বলে মনে হচ্ছে।

'কোথায় চলেছেন ?' জিগগেস করল স্বামীজিকে।

'শিকাগোর ধর্মসভায় যোগ দিতে।'

'উঠবেন কোথায় ?'

'জেনারেল কমিটির চেয়ারম্যান রেভারেন্ড জন হেনরি ব্যারোজ-এর ওখানে।'

'ডক্টর ব্যারোজ ?'

'হ্যাঁ, তাই। দেখুন দেখি এ ঠিকানাটা কোথায় হবে ?' স্বামীজি পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে দেখালেন সেই ভদ্রলোককে।

কাগজের উপর একবার চোখ বুলিয়েই ভদ্রলোক বললেন, 'আমিও যাচ্ছি ওদিকে। আমি আপনাকে ঠিক পৌঁছে দেব ঠিক জায়গায়।'

ঈশ্বরের কৃপা অহেতুক। তাঁর রঙ্গও অকারণ। প্রকাণ্ড স্টেশন শিকাগো। দুর্দান্ত জনসমুদ্র। উত্তাল ব্যস্ততা চতুর্দিকে। ভিড়ের ঢেউয়ের মধ্যে সেই সদাচার ভদ্রলোক কখন যে কোথায় তলিয়ে গেলেন টের পেলেন না স্বামীজি। গলা বাড়িয়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলেন, টিকিরও সন্ধান মিলল না। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, নিজেই তবে খুঁজে-পেতে বার করতে হয় ব্যারোজের আস্তানা। ঠিকানাটার জন্যে পকেটে হাত ঢোকালেন স্বামীজি। কই, কই সেই কাগজের টুকরোটা ? সেই ঠিকানা-লেখা কাগজের টুকরোটাও অন্তর্হিত। এখন উপায় ? কাউকে জিগগেস করি।

পথচারীদের সম্মুখীন হলেন স্বামীজি। বলতে পারো ধর্মমহাসভার অফিসটা কোথায় ? ডক্টর ব্যারোজের নাম শুনেছ ? বলতে পারো কোনদিকে তাঁর বাড়ি ?

সবাই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। উঁ শব্দটিও করে না। কেউ-কেউ বা সটান অগ্রাহ্য করে, পাশ কাটিয়ে চলে যায়। বিন্দুমাত্র সাহায্য করবারও কারু মন নেই।

প্রথমত এটা জর্মানদের পাড়া, দ্বিতীয়ত এ লোকটা কাফ্রি না নিগ্রো তার ঠিক কি।

'অন্তত দিতে পারো একটা হোটেলের ঠিকানা ?'

কেউ গ্রাহ্যও করে না। যার পথে যে, সরে পড়ে। সন্ধ্যা হয়ে এল। চারদিকে অন্ধকার দেখলেন স্বামীজি। ফিরলেন স্টেশনের দিকে, উঠলেন এসে মালগাড়ির খোলা

ইয়ার্ডে। দেখতে পেলেন কতগুলি খালি কাঠের বাক্স পড়ে আছে এদিক-ওদিক। বড় দেখে বাছলেন একটা। আর তার মধ্যেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেন কুঁকড়ি-সুঁকড়ি হয়ে।

আশ্রয় নেই আহার নেই—তাই বলে ভয় বা নৈরাশ্য বলেও কিছু নেই স্বামীজির। যিনি সমস্ত অন্ধকারে দীপপ্রদ উপস্থিতি সেই শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন তাঁর শিয়রে, তাঁর হৃদয়ের মধ্যে। সমস্ত বিপদে যিনি আশ্বাস, সমস্ত ব্যাধিতে যিনি ওষধি, সমস্ত প্রত্যাখ্যানেও যিনি অপরাঙ্মুখ। দুশ্চিন্তার কুয়াশার রেখাটিও কোথাও রইল না, পরম আরামে ঘুম এল স্বামীজির। পথ চলতে চলতে যেখানেই সন্ধ্যা হয় সেখানেই সন্ন্যাসীর রাত্রির শয্যা, তা সে রাস্তার ফুটপাথই হোক বা রেলইয়ার্ডের কাঠের বাক্সই হোক।

অক্রিয়াই পরাপূজা, মৌনই পরম জপ, অচিন্তাই পরম যোগ, অনিচ্ছাই পরম সুখ। শান্তির মত আর মন্ত্র নেই, নিজের মত আর দেবতা নেই, আত্মানুসন্ধানের মত আর অর্চনা নেই, তৃপ্তির মতো আর ফল নেই। আমি ভবার্ণবে মজ্জমান বলেই তো তুমি আমায় উপযুক্ত কুল। আর তুমি কৃপা দিতে অকৃপণ বলেই তো আমি তোমার উপযুক্ত পাত্র।

ভোর হতেই উঠে পড়লেন স্বামীজি। হাওয়াতে যেন জলের ঘ্রাণ পেলেন। খানিক এগিয়ে দেখতে পেলেন হ্রদ আর তার পাড় বেয়ে প্রশস্ত রাস্তা যে রাস্তায় বিলাসী ধনীদেরই বসবাস। রাস্তার মতই মনও যদি তাদের প্রশস্ত হত! নিদারুণ খিদে পেয়েছে স্বামীজির, কে তাঁকে দু'টুকরো রুটি দেবে, গ্রাসে দেবে একটু আচ্ছাদন! ভিক্ষে করলে কেমন হয়! আমি সন্নেসী, আমার ভিক্ষে করতে কী দোষ? সন্নেসী তো চিরকেলে ভিক্ষুক। দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষে চেয়ে ফিরতে লাগলেন স্বামীজি। যতটুকু দিয়ে আমার এ বেলার ক্ষুধার নিবৃত্তি, শুধু ততটুকুই আমার ভিক্ষে। অতিরিক্তে আমার স্পৃহা নেই কণামাত্র। অপমান করে তাড়িয়ে দিল দ্বারীরা। পরনে ময়লা কাপড়, সমস্ত গায়ে-পায়ে ধুলো, এ কে কিম্ভুতকিমাকার! আর কি স্পর্ধা, খেতে চায় একমুঠো। খাদ্য খাবার কেউ ভিক্ষে করে নাকি? কেউ-কেউ মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয় সজোরে।

'ভিক্ষে না দাও ধর্মমহাসভার ঠিকানাটা বলে দাও।'

কেউ কর্ণপাতও করে না। কোথায় গেলে বা শহরের ডিরেক্টরি বা টেলিফোন-গাইড পাবে তারও হদিস জানা নেই স্বামীজির। কি করি কোথায় যাই কাকে ধরি। যতক্ষণ পায়ে শক্তি আছে হাঁটি, যেখানেই শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ব সে তোমারই কোল আর তুমি ছাড়া কে আছে আমার হাত ধরবে!

হে জগদীশ্বর, তুমি আমাকে বিতাড়িত করলেও আমি তোমার পাদপদ্ম ছাড়ব না। রোষহেতু মাতার দ্বারা নিরস্ত হলেও স্তনান্ধ শিশু মায়ের চরণ ছাড়ে না কিছুতেই। তুমি থাকতে আমি নিজেকে অসহায় ভাবব? আমি আর কিছুই চাই না, আমাকে ধৈর্য দাও, তোমার অনন্তশক্তিই আমার রক্ষক আমার এই বিশ্বাসকেই আরো দৃঢ় কর, এই বিপদ-বাধা তোমারই মঙ্গলেচ্ছা, দাও সেই অভয়-আশ্বাস। আমার অহঙ্কারকে চূর্ণ করবার জন্যে আমাকে দীন করো, কিন্তু তোমার আনন্দ থেকে আমাকে বিচ্যুত কোরো না। যে ভয়গ্রস্ত সেই নিরানন্দ। আমাকে সর্বংসহ কর। যেন চিন্তা-বিলাপ-বর্জিত হয়ে থাকতে পারি শেষ পর্যন্ত।

অবসন্ন হয়ে পথপ্রান্তে বসে পড়লেন স্বামীজি। যা হবার তাই হোক। উত্তীর্ণ হই কি না হই, চরম পরীক্ষার শেষ উত্তর দিয়ে যাই।

'আপনি কি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি?' কে একজন জিগগেস করল কাছে এসে।

ভদ্র, মার্জিত, কোমল কণ্ঠ। চোখ চাইলেন স্বামীজি। রানীর মত দেখতে, স্বরে ও দৃষ্টিতে দ্রবীভূত দাক্ষিণ্য। আশ্চর্য, কি করে চিনতে পারল? কে পরিচয় দিয়ে দিল কানে-কানে?

'হ্যাঁ, সেখানে যাব বলেই বেরিয়েছি।'

'কিন্তু এখানে কেন—এ অবস্থায়?'

স্বামীজি আনুপূর্বিক বললেন তার দুর্দশার কথা।

'আপনি আমার সঙ্গে আসুন।' ভদ্রমহিলা মমতাভরা ঔদার্যে আহ্বান করলেন স্বামীজিকে: 'রাস্তার ওপারে ঐ আমার বাসা। আমার সঙ্গে চলুন। আপনি আমার অতিথি।'

এ কি সম্ভব? নাকি এ ইন্দ্রজাল? যে মাকে মেনেছে নরেন এ কি সেই আর্দ্রান্তরাত্মা জননী। করুণার কল্পলতা। পীযূষবাদিনী স্বর্গবর্গদা।

'আপনি কে জানতে পারি?' ভঙ্গুর পায়ে উঠে দাঁড়ালেন স্বামীজি।

'আমি মিসেস জর্জ হেল।'

শালীন, বদান্য ভঙ্গি। স্বামীজি উঠে পড়লেন। অনুগমন করলেন।

'তিনি কি সারাজীবন তাঁর কোলে আশ্রয় দিয়ে এখন পরিত্যাগ করবেন? কখনো করবেন?' লিখছেন স্বামীজি: 'হিংস্র বাঘের মধ্যেও তিনি, মৃগশিশুর মধ্যেও তিনি। ভগবানের যদি কৃপাদৃষ্টি না থাকে, সমুদ্রে একফোঁটাও জল থাকে না, গভীর জঙ্গলেও এক টুকরো কাঠ পাওয়া যায় না, আর কুবেরের ভাণ্ডারেও মেলে না এক মুঠো অন্ন। আর যদি তাঁর কৃপা হয়, মরুভূমিতে নির্মলজল স্রোতস্বতী বইতে থাকে আর ভিখারী ভিক্ষুকেরও জুটে যায় অঢেল দৌলত। একটা চড়ুই পাখি কোথায় উড়ে যাচ্ছে, কোথায় বা ঝরে পড়ছে একটা শুকনো পাতা, তাও তিনি দেখতে পান।

প্রভু, আমার শিব, তুমিই আমার ভালো তুমিই আমার মন্দ। তুমিই আমার গতি আমার নিয়ন্তা, আমার শরণ, আমার সখা, আমার গুরু, আমার ঈশ্বর, আমার যথার্থ স্বরূপ। আমি কখনো-কখনো একলা প্রবল বাধাবিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে-করতে দুর্বল হয়ে পড়ি, তখন মানুষের সাহায্য পাবার জন্য ব্যগ্র হই। আমায় চিরদিনের জন্য এ সব দুর্বলতা থেকে মুক্ত করে দাও, যেন আমি তোমা ছাড়া কখনো কারু কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করি। যদি কোনো লোক কোনো ভালো লোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সে কখনো তাকে ত্যাগ করে না বা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। তুমি প্রভু, সকল ভালোর সৃষ্টিকর্তা, তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে? তুমি তো জানো সারা জীবন আমি কেবল তোমারই দাস। তুমি কি আমাকে ত্যাগ করবে যাতে অপরে আমাকে প্রবঞ্চনা করবে বা আমি অশুভের দিকে চলে পড়ব?'

মিসেস হেল স্বামীজিকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে প্রচুর সেবাশুশ্রূষা আপ্যায়ন করলেন। শুধু তাই নয় ধর্মমহাসভার কার্যালয়ে নিয়ে গেলেন, পরিচয় করিয়ে দিলেন কর্মাধ্যক্ষদের সঙ্গে, যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে। যত সব বিধিনিয়মের বাধা ছিল সব অপসৃত হয়ে গেল। এখন শুধু দুজন, আকাশে

ঈশ্বর আর মাটিতে ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্মের এক ব্যাখ্যাতা। নিজের কথা ভাবছেন না স্বামীজি। ব্যক্তিগত সাফল্য তাঁর লক্ষ্য নয়। তাঁর লক্ষ্য হিন্দুধর্মের জয়, ভারতবর্ষের জয়। সমস্ত বিশ্ব বন্ধুকে তার উদার মন্ত্র, তার মিলন মন্ত্র। সমস্ত বিশ্ব বন্ধুকে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী।

হেলদের বাড়ির সামনেই লিংকন পার্ক। সেখানে মাঝে মাঝে রোদ্রে হাওয়ায় বসেন এসে স্বামীজি। একটি তরুণী মা তার ছ বছরের ছোট একটি মেয়ে নিয়ে বাজারে যায় স্বামীজির সামনে দিয়ে। স্বামীজি দেখেও দেখেন না। কিন্তু তরুণী মা দেখে সেই উজ্জ্বল স্নিগ্ধ সন্ন্যাসীকে, কি দয়াভরা চোখ, কি বিশ্বাসব্যঞ্জক দীপ্তি। একদিন তরুণী এসে বললে, 'আমার এই দুষ্টু মেয়েটিকে একটু দেখবেন ? আমি বাজারটা সেরে আসি। বাড়ি ফেরবার সময় নিয়ে যাব।'

খুশি হয়ে স্বামীজি মেয়েটির ভার নিলেন। এমন এক দিন নয়, কয়েক দিন।

মেয়েটির যখন ষোলবছর বয়স তাকে তার মা স্বামীজির একখানি ফোটো দেখাল। বললে, 'এঁকে চিনিস ?'

'চিনি মা চিনি। কোথায় তিনি ?' আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মেয়ে।

সেই ছ বছর বয়সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে দেখা সেই ভাস্বর স্নেহমূর্তি অন্তরে গাঁথা হয়ে আছে সেই মেয়ের। সেই মেয়ে আজ ভক্তির সরোবরে শ্বেত শতদল।

মিসেস হেল মহাসভার আপিসে নিয়ে গেল স্বামীজিকে। দেখুন, প্রাচ্যধর্মের এ আরেকজন প্রতিনিধি। এই এঁর পরিচয়পত্র।

আর কথা কি। নির্বাচিত হলেন স্বামীজি। আর আর প্রাচ্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্র বাসা পেলেন। সমস্ত সুলভ ও সুগম হয়ে গেল।

আপনি কোন্ ধর্মের ?

'হিন্দুধর্মের।' গৌরবগাঢ় কণ্ঠে বললেন স্বামীজি।

আপনি ?

'আমি ব্রাহ্মধর্মের।' বললেন প্রতাপ মজুমদার। 'আর ইনিও আছেন আমার সঙ্গে।' দেখিয়ে দিলেন বম্বের নাগারকারকে।

আপনি ?

'আমি থিয়সফির।' বললেন চক্রবর্তী। 'আর ইনিও আমার দলে।' এনি বেসান্টকে দেখিয়ে দিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম আর থিয়সফি তো হিন্দুধর্মেরই শাখা। তা কে না জানে। তবু এঁরা মজুমদার আর চক্রবর্তী, যখন স্বতন্ত্র হতে চাচ্ছেন তখন তাই হোন। আমি সকলকে নিয়ে, আমিই সনাতন। আমার ধর্মের কোনো প্রবর্তন নেই, কোনো পরিবর্তনও নেই। আমি সর্বব্যাপী, অপরিণামী। আমি সেই এক সত্তা, আমরা সকলে সেই এক সত্তা—এই আমার ধর্ম, হিন্দুধর্ম। শাশ্বত ধর্ম।

মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও বলো, আমিই সেই। এক সন্ন্যাসী ছিল, অনুক্ষণ শিবোঽহং, শিবোঽহং আবৃত্তি করত। একদিন একটা বাঘ এসে তার উপর লাফিয়ে পড়ল ও তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলল। যতক্ষণ বেঁচে ছিল ততক্ষণ শোনা গিয়েছিল সাধুর কণ্ঠস্বর : শিবোঽহং, শিবোঽহং। মৃত্যুর দ্বারে, ঘোরতর বিপদে, রণক্ষেত্রে, সমুদ্রতলে, পর্বতশিখরে, গভীরগহন অরণ্যে, যেখানেই পড়ো না কেন, সর্বদা বলতে থাকো,

আমিই সেই, আমিই সেই। যতক্ষণ না প্রত্যেক স্নায়ু, মাংসপেশী এমন কি প্রত্যেক রক্তবিন্দু পর্যন্ত এই ভাবে পূর্ণ হয়ে যায়, ততক্ষণ কানের মধ্য দিয়ে এই তত্ত্ব ভিতরে প্রবেশ করাও। দিনরাত বলতে থাকো, আমিই সেই। কোথায় আমার ভয় কোথায় আমার পাপ কোথায় আমার দৌর্বল্য। আমি নিত্যমুক্ত, আমি কোনোকালে বদ্ধ নই, আমি অনন্তকাল ধরে এই জগতের ঈশ্বর। আমাকে আবার পূর্ণ কে করবে? আমিই নিরবধি গগনাভ, অতিবেলনিরুপম, আমি নিত্য পূর্ণস্বরূপ। আমি সেই তেজোময় স্বপ্রকাশ পুরুষ, আমি দেহ নই আমি আত্মা আমি ব্রহ্ম—এই ধর্মই আমার হিন্দুধর্ম।

'হিন্দুধর্মের মত আর কোনো ধর্ম এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না', লিখছেন স্বামীজী 'আবার হিন্দুধর্ম যে পিশাচের মত গরিব ও পতিতের গলায় পা দেয় জগতে আর কোনো ধর্মে তেমন নেই। এতে ধর্মের কোনো দোষ নেই, শুধু কতগুলি আত্মাভিমানী ভণ্ড ভেদবুদ্ধির সাহায্যে এই আসুরিক অত্যাচারের ব্যবস্থা করে চলেছে। সমাজের এই অবস্থাকে দূর করতে হবে, হিন্দু ধর্মকে ক্ষুণ্ণ করে নয়, হিন্দুধর্মের মহান উপদেশগুলি অনুসরণ করে ও তার সঙ্গে হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি যে বৌদ্ধধর্ম তার হৃদয়বত্তা মিশিয়ে। সুতরাং পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হও, ভগবৎবিশ্বাসের বর্ম পরো, তারপর দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতের প্রতি প্রেমে প্রেরিত হও। সিংহবিক্রমে বুক বেঁধে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করো। সেবা ও সাম্যের মঙ্গলময় বাণী প্রচার করো দ্বারে দ্বারে।'

ধর্মমহাসভা হচ্ছে কেন? কী উদ্দেশ্য? পৃথিবীর যাবতীয় মহৎধর্মগুলিকে এক রঙ্গমঞ্চে একত্র করা। বিভিন্ন ধর্মে কী ঐক্য আছে তাই বিশ্বের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরা। তার জন্যে প্রত্যেক ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তাকে নির্বাচন ও নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে। কোন ধর্মের কী বৈশিষ্ট্য, সত্যকে দেখবার ও পাবার কার কী পথ ও প্রণালী তার এবার বিচার-বিস্তার হবে। দেখা হবে এক ধর্ম আরেক ধর্মকে সাহায্য করতে পারে কিনা, পারলে কিভাবে পারে। ঐহিক সমস্যা, সামাজিক বৈষম্য, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা, যাবতীয় অত্যাচার অব্যবস্থার অপনয়ন করতে ধর্মের কী শক্তি, কিংবা শক্তি তার আদৌ আছে কিনা। সর্বত্তম উদ্দেশ্য, আন্তর্জাতিক শান্তি আনতে পারে কিনা ধর্ম—তার পরীক্ষা। পারস্পরিক সৌভ্রাত্রে সম্ভব কিনা সহ-অবস্থান।

দেশ-দেশান্তর থেকে নিমন্ত্রিত হয়েছে মনীষীরা। পরিচালক কমিটিতে প্রায় তিন হাজার সভ্য। প্রায় দু বছরের উপর চলেছে এর তোড়জোড়। রাশি-রাশি পত্র, রাশি রাশি দলিল, স্তূপের পর স্তূপ, বাণ্ডিলের পর বাণ্ডিল। একটানা সতেরো দিন ধরে সভা চলবে, সকালে বিকেলে ও সন্ধ্যায় অবিচ্ছিন্ন বক্তৃতা। এলাহি কাণ্ড, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন আর হয়নি কখনো। অগণন লোক কাজ করছে অফিসে। প্রায় দশ হাজারের উপর চিঠি চল্লিশ হাজারের উপর দলিল। বক্তৃতা যে কত হবে তার অন্ত নেই। লিখিত পঠিত উদ্গীরিত। শুধু বাক্যের বুদ্বুদ। বাক্যের উৎপাত।

কমিটিতে ভারতীয় পাঁচজন। হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক আয়ার, নাগারকার, প্রতাপ মজুমদার, মহাবোধি সোসাইটির সেক্রেটারি ধর্মপাল আর জৈনদের প্রতিনিধি মুনি আত্মারাম। স্বামীজি? স্বামীজি কেউ নন। তিনি উপর-পড়া। তিনি রবাহূত। ঢাল নেই তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার।

কিন্তু একবার যখন মনোনীত হয়েছি, পেয়েছি প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার, দৃঢ় করে

পতাকা তুলে ধরব উর্ধ্বে। প্রভু, শক্তি দাও। আমাকে তোমার হাতের শঙ্খ করে তোলো। আমি যেন হতে পারি হিন্দুত্বের যোগ্য ভাষ্যকার, হতে পারি তোমারই যোগ্য বার্তাবহ। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু ছাড়া আর কিছু নেই সংসারে। রজ্জুতে সর্পের ন্যায়, শুক্তিতে রজতের ন্যায়, মরীচিকায় জলভ্রান্তির ন্যায় যাতে জগৎ ভাসমান সেই মহারুদ্র সত্য-স্বরূপের শরণাপন্ন হই।

পরদিন, এগারোই সেপ্টেম্বর, সভার প্রথম দিন।

সারারাত ধ্যানে ও প্রার্থনায় কাটালেন স্বামীজি। হে মন! নিজেকে কখনো পরাভূত মনে কোরো না। সর্বদা তোমার মাথা উঁচুতে রাখো। কারণ তুমি যে ঈশ্বরের বাহক। তুমিই যে গরুত্মান বেদ। তুমি মহতো মহীয়ান। তুমি ধর্মরূপী বৃষভ, খাদ্য বেদান্ত, যা মানুষকে বলবান বীর্যবান ও ওজস্বী করে। তোমার জ্ঞানে সর্বাস্তিত্বের প্রমাণ, তাই সর্ব-বিধানের প্রতিষ্ঠাই তোমার ধর্ম। তোমার মন্ত্র সমন্বয়। তোমার শুধু সংগতির সংগীত।

৪৯

আঠারোশ তিরানব্বই সালের এগারোই সেপ্টেম্বর, সোমবার, বেলা দশটায় গম্ভীরনাদে ঘণ্টা বেজে উঠল। একে-একে দশবার। পৃথিবীর প্রধানতম দশ ধর্মকে আহ্বান করা হচ্ছে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, জুডা, তাও, কনফুসিয়ান, শিন্তো, জোরোয়াস্ট্রিয়ান, ক্যাথলিক, গ্রীক চার্চ আর প্রটেস্টান্ট। তালিকা প্রস্তুত করেছেন প্রেসিডেন্ট বার্নি। কিছু বলবার-কইবার নেই। আমার দেশে তোমাদের নিমন্ত্রণ।

খৃস্টান দেশে অখ্রীস্টীয়দের যে ডাকা হয়েছে তাই যথেষ্ট। শুধু ঐ অতিকায় দশজনই নয়, লঘুদেহ আরো অনেকেই পাত পেয়েছে। উদ্যোক্তাদের মনে গোড়ায় এক ভাব এসেছিল, অত হাংগামার দরকার কি, শুধু খ্রীস্টধর্মের গুণগান করবার জন্যে সভার আয়োজন হোক। আর সব ধর্ম খ্রীস্টধর্মের চেয়ে নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ তাই প্রতিপন্ন করা হোক ঢাকেঢোলে। শেষ পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্কের পর ঠিক হল অমন কাঠখোট্টা গোঁয়ারতুমি প্রত্যক্ষে না করাই শোভন হবে। বস্তুত সত্য যখন একমাত্র খ্রীস্টধর্মে, উদ্যোক্তারা আশ্বস্ত হলেন। অন্যান্য ধর্ম তো এমনিতেই হেরে যাবে। আসুক না যত সব আচার-অনুষ্ঠানের ঝুলি নিয়ে, কুসংস্কারের পুঁটলি বেঁধে। দেখি না কার কত দৌড়। সত্যের সঙ্গে সত্যের সঙ্গে কে কবে পেরেছে? সুতরাং খ্রীস্টধর্মের জয় অবধারিত।

তাই ব্যারোজ অবারিত হতে পারলেন নিমন্ত্রণে। অভাগ্য অভ্যাগতদের এমন আশ্বাসও দিলেন, ভয় নেই, কোনো কলহ বা তিক্ততার প্রশ্রয় দেওয়া হবে না, সর্বক্ষণ বইবে বন্ধুতার প্রফুল্ল হাওয়া। অন্যকে খণ্ডন নয় শুধু নিজের কীর্তন। অন্যকে পাতন নয় শুধু নিজের স্থাপন!

তাই ঘণ্টা বাজল মন্দিরে।

উদ্যোগের পুরোহিতেরা কিন্তু মুখ লুকিয়ে হাসল। ক্রিশ্চিয়ানিটির সামনে আবার স্থাপন-কীর্তন কি! কে দাঁড়াবে শক্ত পায়ে! কে গাইবে গলা উঁচিয়ে।

মিচিগান এভিনিয়ুর পারে আর্ট ইনস্টিটিউট। তার বিরাটতম হল-ঘরে, হল অফ

রুদ্ধশ্বাসে সভা হচ্ছে। হলের এক পাশে প্রকাণ্ড মঞ্চ সামনে পর-পর গ্যালারির কাতার, লোকের পর লোক গাদি মেরে বসা। ছ থেকে সাত হাজারের মধ্যে। মঞ্চে দেয়ালের দিকে দু পাশে দুই গ্রীক দার্শনিকের মূর্তি, মাঝখানে বিদ্যার দেবী, হিন্দুদের সরস্বতীর অনুরূপ। হাতের মুদ্রা অভয়ংকরী।

একটু এগিয়ে এসে মাঝখানে উঁচু এক সিংহাসন, তার দু দিকে সারবাঁধা কাঠের চেয়ার। সিংহাসনে এসে বসল কার্ডিনাল গিবসন, আমেরিকার ক্যাথলিক চার্চের প্রধান বিশপ। আর কাঠের চেয়ারে আসন নিল দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিরা, আর যারা সভার সঙ্গে উচ্চ তন্ত্রে যুক্ত কিংবা যারা বিশেষ অতিথি।

মঞ্চের উপর, চতুর্দিকে রঙের ঢেউ উঠেছে। চীনা বৌদ্ধদের শাদা পোশাক, গ্রীক চার্চের বিশপদের কালো। জাপানের রঙ রমধনুর, কারুর বা শাদা আর হলদের মিতালি। কেউ পরেছে উচ্চ লালের ধার ঘেঁষে। শুধু কি রঙ? আছে আবার ছাঁট-কাটের বৈচিত্র্য। কেউ আটসাঁট কেউ বা ঢিলেঢালা। প্রতাপ মজুমদারের তো চোস্ত স্যুট। আর ধর্মপাল শাদা একটি পশমের ঢিপি। এরই মধ্যে একখানি চেয়ারে বসে আছেন বিবেকানন্দ, সকলের চেয়ে বয়সে ছোট, মোটে ত্রিশ বছরের যুবক, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা আর মাথায় গেরুয়া পাগড়ি—যেন আশার আকাশে আশ্বাসের সূর্য।

সামনে বিশাল-বিপুল জনতা। শুধু একতাল নির্বিচার মানুষের পিণ্ড নয়, শিক্ষিত বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীদের ভিড়। তার মধ্যে যাজক-পুরোহিতও অসংখ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে কস্মিনকালেও হয়নি এত বড় ধর্মসভা। একই মঞ্চে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের সম্মিলন। কি করে বলব এদের সামনে দাঁড়িয়ে? স্বামীজির গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, বুক কাঁপছে ঢিপঢিপ করে, হাতে-পায়ে বল-বশ কিছু নেই।

প্রথমেই বলতে উঠল গ্রীক চার্চের প্রতিনিধি, জান্তের আর্কবিশপ। তারপরে প্রতাপ মজুমদার। তারপরে পুং কুয়াং ইউ, কনফুসিয়ানিজম-এর প্রবক্তা। তারপরে চক্রবর্তী। তারপরে বৌদ্ধ ধর্মপাল।

'এবার আপনি।' স্বামীজিকে চিহ্নিত করলেন সভাপতি।

'আমার নম্বর তো একত্রিশ।' বললেন স্বামীজি।

'তা হোক। এখনই বলুন। এ সকালের পর্বেই।'

'না, এখন না।' গম্ভীর হলেন স্বামীজি: 'পরে বলব।'

স্বামীজি দেখলেন সবাই কেমন লিখে এনেছে বক্তৃতা। কি বলবে সব গুছিয়ে-গাছিয়ে তৈরি করে এনেছে। নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন স্বামীজি—তাঁর কেন এমন বুদ্ধি হয়নি? এখন আর লেখবার সময় কোথায়? কোথায় বা মিলবে এখন গবেষণার মালমশলা? কেমন সবাই সানন্দ হাততালি পাচ্ছে, তার বেলায় সবাই বোধহয় ছি-ছি করে উঠবে, ছি-ছি না করুক হয়তো বসে থাকবে বিরসমুখে। সভায় কোনো দীপ্তি থাকবে না, স্বাদ থাকবে না, স্ফূর্তি থাকবে না। সব বিবর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।

বিকেলের পর্বে প্রথমেই ডাক পড়ল স্বামীজির।

'এখন না।'

লোকটা কি দেবে না নাকি বক্তৃতা? বারে-বারে এড়িয়ে যাচ্ছে কেন? সমুদ্রের মত জনতা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে বুঝি? দু'চার কথা বলবার মতও সাহস নেই? আবার ইঙ্গিত এল স্বামীজির কাছে।

'আরো পরে।'

এ কি অকরণ! যদি মুখ বুজে নিষ্ক্রিয় হয়েই থাকবে তবে এলে কেন? আসবার জন্যে, টিকিট পাবার জন্যে কত না লড়াই করেছিলে? ভেবেছিলে এ বুঝি ক্লাবঘরে বক্তৃতা না কি মাঠের চিৎকার! যে ধর্মের প্রতিনিধিই এমন ভীরু সে ধর্মের আবার আস্ফালন কি। চুপ করে আছ, তবে চুপ করেই থাকো।

আরো চার-চার জন প্রতিনিধি তাদের লিখিত বক্তৃতা পড়লেন। যথারীতি হাততালি পেলেন সকলে।

প্রার্থনার ভঙ্গিতে আত্মস্থের মত বসেছিলেন এতক্ষণ, এবার উঠে দাঁড়ালেন স্বামীজি। এবার স্বামীজির বলবার লগ্ন।

দেখ, দেখ, কে দাঁড়িয়েছে মঞ্চে। যৌবনোজ্জ্বল কী মহৎ মূর্তি! কী আশ্চর্য সুন্দর পোশাক। দেখ, দাঁড়াবার কী দৃঢ়দীপ্ত ভঙ্গি। আর চোখ দেখেছ? প্রেম আর প্রার্থনা একসঙ্গে। বীর্য আর মাধুর্যের সংযোগ। পবিত্রতায় জ্বলছে যেন আগুনের মত। কী না জানি বলে! কী না জানি তার বলবার!

সরস্বতীকে মনে-মনে বন্দনা করলেন স্বামীজি। মঞ্চে যিনি অধিষ্ঠিতা সেই বিদ্যাধিদেবীকে নমস্কার। ঋষিসূক্ত মনে পড়ল বোধহয়।

কেউ বাণীকে দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না। কিন্তু কারো-কারো কাছে তিনি আপন স্বরূপ প্রকট করেন, যেমন সুবাসা স্ত্রী পতির নিকট প্রকাশিতা।

যিনি ব্রহ্মার মুখে বিরাজমানা সেই সর্বশ্বেতকান্তি সরস্বতী আমার মানস-সরসে নিত্য বিহার করুন। হে দেবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, মাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠা, নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, আমাকে বিদ্যা দাও, প্রশস্তি দাও, দাও প্রতিভা-কল্পনা। তোমার চারহাতে অক্ষসূত্র, অঙ্কুশ, পাশ আর পুস্তক। তুমি আমার জিহ্বাগ্রে বাস করো। তুমিই শ্রদ্ধা, তুমিই মেধা, তুমিই ধারণা। তুমিই মধুচ্ছন্দা। হে স্মিতমুখী সুভগে, তোমাকে নমস্কার। 'মাতর্মার্তেনমস্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধিং প্রশস্তাং। শাস্ত্রে বাদে কবিত্বে প্রসরতু মমধীর্মাস্তু কুণ্ঠা কদাচিৎ॥'

প্রথম কথা কী বললেন স্বামীজি? কী তাঁর সম্ভাষণ?

লেডিস য়্যান্ড জেন্টলম্যান নয়, বললেন, সিস্টার্স য়্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা। এ আর এমনি কি নতুন বললেন? মামুলি লেডিস য়্যান্ড জেন্টলম্যান-এর চেয়ে বেশি কি অভিনব! এতক্ষণ ধরে ভাষণে-বক্তৃতায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই কথাই তো বারে-বারে বলা হয়েছে যে সবাই আমরা এক পিতার সন্তান, পরস্পর সবাই আমরা ভাইবোন। তাই স্বামীজির এই সম্বোধনে এমন কি বাহাদুরি!

বাহাদুরি এইখানে যে, ও শুধু মুখের কথা নয় ও প্রাণের কথা, সত্যের স্পর্শে গদ্গদ! শুনেছ কী উদাত্ত কণ্ঠ, যেন মুক্তদ্বার মন্দিরের ঘণ্টা বাজছে, আর এ স্বর তাপে তেজে ছন্দে গন্ধে অপরূপ। যদি এমনি কথার কথা হত, যদি না থাকত এতে সারল্যের সম্পদ, অন্তরের অমৃত, তাহলে কে করত প্রতিধ্বনি? বায়ুতরঙ্গে আরো অনেক কথার মত মিলিয়ে যেত বুদ্বুদ হয়ে।

কিন্তু এ বলায় হল কী? করতালিতে উত্তাল হয়ে উঠল জনতা। এ মামুলি করতালি নয়, এ রুদ্ধ হৃদয়ের উদ্ঘাটন। উল্লাসের জলপ্রপাত। শেষের সমর্থন নয় আরম্ভের অভ্যর্থনা। আরম্ভের জয়ধ্বনি। এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট—থামতে চায় না।

এমন করে কে কবে বলেছে ! কণ্ঠস্বরে মিশিয়েছে এমন প্রগাঢ় আন্তরিকতা ! কার এমন তেজঃপুঞ্জ ব্যক্তিত্ব ! কার এমন উদার-উজ্জ্বল ভঙ্গি । শুধু একটা ভাবালুতা নয়, কার এমন সত্যের স্পষ্টতা ! আমেরিকাবাসীর মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীকে সম্বোধন ! উতরোল থামতে চায় না কিছুতেই । উৎসাহে দাঁড়িয়ে পড়েছে অনেকে । হাততালির শব্দে মনে হচ্ছে দেয়াল-ছাদ ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে । সমুদ্র হয়ে যাবে মানুষের জনতা । মানুষের হৃদয় ।

একটি শব্দের জাদুস্পর্শে এমন অঘটন ঘটবে কল্পনার অতীত ছিল স্বামীজির। তিনি কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলেন । বুঝলেন, একেই বলে আদ্যাশক্তি, মাতৃশক্তির লীলা । একেই বলে কৃপাশক্তির বিস্ফোরণ ।

কিন্তু লোকজন একটু শান্ত না হলে আমার বক্তব্যটুকু পেশ করি কি করে ? শান্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন স্বামীজি । শান্ত স্থির হয়ে গেল জনতা ।

বলতে শুরু করলেন স্বামীজি । প্রথমেই পৃথিবীর তরুণধর্মদের প্রাচীনতম ধর্মের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা করলেন । আর সব ধর্ম নতুন, হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম । আর সব ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে, হিন্দুধর্ম সনাতন । হিন্দুধর্মই সমস্ত ধর্মের জননী ।

হিন্দুধর্ম দুটো জিনিস শিখিয়েছে—সহনশীলতা আর বহনশীলতা । শুধু সইব না, সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে বেড়াব । পথ দিয়ে তুমিও চলো আমিও চলি—হিন্দুধর্ম শুধু এইটুকুই বলে না, বলে, ভাই, কাছে এস, হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলো । হিন্দুধর্ম শুধু মেনে নেয় না, টেনে নেয় ।

আর হিন্দুধর্ম এ শেখায়, সব ধর্মই সমান মহান । সব ধর্মই পৌঁচেছে ঈশ্বরে, সব রাস্তাই রোমে । যে পথ নিয়েই হোক, সোজাই হোক আর আঁকাবাঁকাই হোক, সব নদীই যেমন পড়ছে গিয়ে সমুদ্রে, তেমনি সব ধর্মই মিলছে গিয়ে সেই পরমবিরামে । 'যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।' এ কথাই আমার গুরু, আমার দক্ষিণেশ্বর, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন । জাতীয়-বিজাতীয় হেন সাধন নেই তিনি করেননি, কিন্তু সব সাধনেরই শেষ স্বাদ ঈশ্বর । যত পথ আছে তিনি বিচরণ করেছেন, যত মত আছে আচরণ করেছেন, এবং বলেছেন, যত মত তত পথ । মতই আর ঈশ্বর নয়, পথই আর প্রাপ্তি নয় । কিন্তু সব মতে সব পথেই সেই পরম সম্বোধি । পথ বিচিত্র কিন্তু প্রাপ্তি এক । মত বিচিত্র কিন্তু মানুষ এক, মানুষের ঈশ্বর এক ।

মিনিট পাঁচেক বললেন স্বামীজি এবং বলার শেষে যখন বসলেন, সমস্ত আমেরিকা তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে ।

আর কারো বক্তৃতা শুনতেই চায় না জনতা । এর পরে আর যেন কিছু বলবার নেই । গাইবার নেই । আমাদের ছেড়ে দাও । আমরা যাব ঐ ভারতীয় সাধুর কাছে । আমরা তাঁকে আরো কাছে থেকে দেখব । আরো অন্তরঙ্গ হয়ে শুনব । ধরব তাঁর ঐ গেরুয়া আলখাল্লা । আর, দেখেছ, কি সুন্দর ইংরিজি বলছে ! স্পষ্ট, দ্রুত ও সাধু ইংরিজি ! এমন অবলীলায় বলছে এ যেন তাঁর মাতৃভাষা । কোথায় শিখল এমন বলবার নৈপুণ্য ! জনতাকে দাবিয়ে রাখবার ক্ষমতা । বিদেশী ইস্কুলে-কলেজে পড়েছে নাকি কোনোদিন ? মাঠে-পর্বতে ঘোরা সাধু, এদের আবার শিক্ষায় রুচি, তার আয়াস ! তবে এর বেলায় এ অসাধ্য সম্ভব হয় কি করে ? সন্দেহ কি, অর্থশক্তি নয়, আত্মশক্তি—অধ্যাত্মশক্তি ।

'দর্শন' বলে কোনো কিছু জানত না আমেরিকা, কিন্তু স্বামীজির দর্শন পাবার জন্যে সবাই ক্ষেপে উঠল। কী স্নিগ্ধ আয়তশান্ত চোখ দেখেছ! যদি একবার মুখের দিকে তাকায় মনে হয় যেন প্রাণ জুড়িয়ে গেল। পবিত্র হল দেহ-মন। ভেসে উঠল যেন আরেক জগতের ইশারা। চলো চলো এগিয়ে চলো ভিড় ঠেলে। এমন নয়নের প্রসাদ নেবে না?

'দেশে তুমি থাকো কোথায়?' কে একজন জিগগেস করলে।

'কখনো পাহাড়ে পর্বতে কখনো বা বাজারে বন্দরে। কখনো বা শহরের ফুটপাতে। আমি সর্বস্বাধীন। সর্বত্র আমার গতিবিধি। রাজপ্রাসাদ থেকে গরিবের কুটির, ভিখিরির গাছতলা।'

'খাও কি?'

'যখন যা জোটে। না জোটে তো খাই না।'

'করো কি?'

'মাধুকরী।'

'পয়সা নেই?'

'একটা কপর্দকও না।'

কে একজন পোশাকে আকৃষ্ট হয়েছে। বললে, 'এই বুঝি তোমার দেশের সাধুদের পোশাক?'

'এ তো তোমাদের দেশের বিশেষ এ-অনুষ্ঠানের জন্যে। এ তো ভালো, ভদ্রতম পোশাক। দেশে আমার গায়ে হয় ছেঁড়া কানি, নয়তো চট কিংবা চামড়া।'

'জাত মানো?'

'মানি না।' গম্ভীর হলেন স্বামীজি: 'জাতটা আমাদের সামাজিক প্রথা, ধর্ম নয়।'

'বিয়ে করোনি কেন?' এ একটি তরুণীর প্রশ্ন।

'কাকে বিয়ে করব? যে কোনো মেয়ের দিকে তাকাই আমার মা, জগন্মাতাকে দেখি।'

হোটেলে ফিরে এসে কাঁদতে বসলেন স্বামীজি। ঈশ্বরের কৃপার কথা ভেবে নয়, মুককে বাচাল করেছেন সে কৃতজ্ঞতায় নয়, কাঁদতে বসলেন বঞ্চিত অধঃপতিত দেশবাসীদের দুঃখের কথা ভেবে। আমার দেশের লোকের যখন এত দুঃখ এত দারিদ্র্য তখন এই যশ ও সমাদর দিয়ে আমার কী হবে! যদি দেশকে টেনে তুলতে পারি এই অভাবের পঙ্ককুণ্ড থেকে, তবেই আমার যশ তবেই আমার সমাদর।

৫০

সাতাশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, টানা সতেরো দিন চলছে ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান—সকালে-বিকেলে, কখনো-কখনো দুপুরে। এবং প্রত্যহই কিছু-না-কিছু বলতে হচ্ছে স্বামীজিকে। না বলে উপায় কি। এমনি সব শুকনো জ্ঞানের কথা শুনে অতিষ্ঠ হচ্ছে শ্রোতারা, খানিক পরে-পরেই উঠে-উঠে যাচ্ছে, তাদের ধরে রাখা দুঃসাধ্য।

তখন সেই অবস্থায়, একটি মাত্র মন্ত্র আছে। বশীকরণের মন্ত্র। 'এর পর বিবেকানন্দ বলবে।'

এর পর বিবেকানন্দ বলবে। তবে আর কথা নেই। বসে যাও, যতক্ষণ না এ মন্ত্রণাটা শেষ হয় অপেক্ষা করো। পোষাবে অপেক্ষা করা। কণ্টকঠিনের পরেই মধুমাধবী।

কী আনন্দময় বিবেকানন্দ! কী উজ্জ্বল গভীরস্পর্শ চোখ, কী হৃদয়গলানো গাঢ় কণ্ঠস্বর। মুখের হাসিটিতে বন্ধুতার গন্ধ! আর কী শুদ্ধশুদ্ধ ইংরিজি। হয়তো বা কোথাও একটি পরিচ্ছন্ন আইরিশ সুর।

বিবেকানন্দকে শোনা মানে দেবতাকে শোনা। যেন প্রার্থনার মন্দিরে স্তব-মুগ্ধ হয়ে থাকা। আর কোনো দাবিতে নয়, বিবেকানন্দ যেন বলছে দৈবের দাবিতে। না শুনে তুমি যাবে কোথায়? কে তোমাকে ছুটি দেবে? যেই বিবেকানন্দের বলা শেষ, অমনি প্রায় হল খালি। আর বসে থেকে কি হবে? আর কি শোনবার আছে? বিবেকানন্দ যদি বন্ধ হল, বন্ধ হল আনন্দের জলধারা।

কর্তাব্যক্তিরা বিব্রত হলেন। বিবেকানন্দের বলার পরে সভায় যদি আর লোক না থাকে তা হলে বিবেকানন্দকে সকলের শেষে বলতে বলো। আর সকলের বেলায় লোক থাকবে না এ কেমনতরো কথা!

'আপনারা বসুন। স্থির হোন। বলবেন বিবেকানন্দ।' ঘোষণা করল কর্মকর্তারা।

'বলবেন? কখন বলবেন?'

'সকলের শেষে।'

'কতক্ষণ বলবেন?'

'পনেরো মিনিট।'

তাই সই। বসে যাও। পনেরো মিনিট শোনবার জন্যেই বসে যাব পাঁচ ঘণ্টা। পোষাবে বসে থাকা। পনেরো মিনিটই জীবনের রোমাঞ্চরুচির অভিজ্ঞতা। পনেরো বছর মনে থাকবে। যাবজ্জীবন মনে থাকবে।

সকলেই তো সত্য কথা বলছে, ধর্মের কথা আবার মিথ্যে হয় কি করে? কিন্তু বিবেকানন্দ যা বলছেন তা পুঁথির সত্য নয়, জীবনের সত্য। পরীক্ষিত সত্য, উপলব্ধ সত্য। সে সত্য যেন তাঁর ব্যক্তিত্বে উচ্চারিত। আর তাঁর বাণী যেমনি সরল তেমনি পবিত্র। তাঁর সমস্ত উপস্থিতিই যেন মঙ্গলের আলো। সুহাসবাসিত আশীর্বাদ।

'সমুদয় জগৎ ঈশ্বর দিয়ে আচ্ছাদন করো। জগতে যে সব অশুভ ও দুঃখ আছে তা উপেক্ষা করে নয়, সবই মঙ্গলময় সবই সুখময় এ ভ্রান্ত অলস ভাব অবলম্বন করেও নয়, প্রত্যেক সুখ-দুঃখ মঙ্গল-অমঙ্গলের মধ্যে সজ্ঞান সন্ধানে ঈশ্বরকে দর্শন করে। এই ভাবেই ত্যাগ করতে হবে সংসার—আর যদি সংসার একবার ত্যাগ হয়, বাকি কী থাকে? বাকি থাকে ঈশ্বর। একমাত্র ঈশ্বর। এই উপদেশের তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এই, তোমার স্ত্রী থাক তাতে কোনো ক্ষতি নেই, তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে তার কোনো মানে নেই, কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে দর্শন করো ঈশ্বরকে। সন্তান-সন্ততিকে ত্যাগ করো তার অর্থ কি? ওদের কি রাস্তায় ফেলে দিতে হবে? কখনোই না। ওদের মধ্যেও ঈশ্বরকে দেখ। অনন্তকাল ধরে প্রভুই একমাত্র বিদ্যমান। তিনিই স্ত্রীতে স্বামীতে

সন্তানে, ভালোয় মন্দে, পাপে পাপীতে, হত্যাকারীতে। সবই সেই প্রভুর বস্তু। তোমার ভোগ্য ধনে তিনি, তোমার মনে যে বাসনা তাতেও তিনি। তুমি যদি তোমার বসনে ভূষণে তোমার বচনে মননে তোমার শরীরে ছায়ায় সর্বদ্রব্যে ঈশ্বরকে স্থাপন করে তা হলে জগতে কোথায় দুঃখ কোথায় ন্যূনতা কোথায় বিচ্যুতি ? যে একত্বদর্শী তার আর মোহ কোথায় ?'

আত্মত্যাগের উচ্ছ্বসিত বহ্নি। যৌবনের তেজস্বী উচ্ছ্বাস। সমস্ত সংশয় ও সঙ্কীর্ণ-তার প্রত্যাখ্যান। কে প্রাতিকূল্য করবে, দাঁড়াও সামনে, আমি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ। আমি একা আর সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে। তাই সই, একাই লড়ে যাব খালি হাতে। ত্রিভুবনেশ্বরীর সন্তান হয়েও আমি পথের ভিখারী। আমার মরতে কী ভয়! আমি আমার প্রাণ উৎসর্গ করে যাব আমার ঈশ্বরের জন্যে, আমার পরাধীন দেশের নির্যাতিত অজ্ঞানগৃহাবাসী দরিদ্রদের জন্যে।

এই অকপট সত্য প্রতিষ্ঠার কীর্তিমান মূর্তি বিবেকানন্দ। এত তেজ এত বিশ্বাস এত উন্মুক্ততা এর আগে দেখেনি আমেরিকা। এত সরল এত নির্মল এত বলবীর্যদৃপ্তও কেউ হয়! পথে-ঘাটে চারদিকে ধ্বনিত হতে লাগল—বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ। পত্র-পত্রিকায় শুধু বিবেকানন্দের ছবি। শুধু পত্র-পত্রিকায় নয়, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে টাঙানো হল বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। বড়-বড় অক্ষরে পরিচয় লেখা—সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। যে সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, সে-ই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় খানিকক্ষণ, মাথা নত করে ভক্তিতে। দেহমনোময় ঈশ্বরস্বরের উচ্ছ্বাসে।

মনে সঙ্কল্প করবে, বাক্যে উচ্চারণ করবে, কর্মে সুসিদ্ধ করবে। এই সেই সুসিদ্ধ মূর্তি। দেখ দেখ তার বিদ্যাপ্রদীপ্ত পৌরুষ। বিদ্যা কি ? যার প্রভাবে ব্রহ্ম ও জীবের একত্ববিজ্ঞান অধিগত হয়, তাই বিদ্যা।

'কতগুলো ভুলচুক হয়ে গেছে বলে একেবারে বসে পোড়ো না। তাদের ফলও পরিণামে শুভই হবে। অন্যরূপ হতে পারে না কেননা শিবত্ব ও বিশুদ্ধত্ব আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম। কোনো উপায়েই সেই প্রকৃতির ব্যত্যয় হয় না। আমাদের যথার্থরূপ সর্বদাই একরূপ। জ্ঞানের আলো জ্বালো, এক মুহূর্তে সব অশুভ চলে যাবে। নিজের প্রকৃত স্বরূপকে প্রকাশ করো। অতি জঘন্য মানুষ দেখলে তার বাইরের দুর্বলতাকে লক্ষ্য কোরো না, লক্ষ্য কোরো তার হৃদয়নিহিত ভগবানকে, আর তার নিন্দা না করে বোলো, হে স্বপ্রকাশক, হে জ্যোতির্ময়, ওঠো। হে সদাশুদ্ধস্বরূপ, হে সর্বশক্তিমান, হে অজ অবিনাশী, আত্মস্বরূপে প্রকাশ করো। তুমি যে ক্ষুদ্রতায় আবৃত আছ, আবদ্ধ আছ, এ তোমাতে সাজে না। তোমার মধ্যে যে অমিতশক্তি দৈত্য প্রসুপ্ত আছে তাকে জাগ্রত করো, শৃঙ্খলমুক্ত করো। অদ্বৈতবাদ এই শ্রেষ্ঠতম প্রার্থনারই উপদেশ। শুধু নিজরূপ স্মরণ করো, তার অর্থ শুধু সেই অন্তরস্থ ঈশ্বরকেই স্মরণ করো, সেই সদাশিব সদাশক্তি সদাশুদ্ধ পুরুষকে। যে মুহূর্তে আমি অদ্বৈতবাদী, সেই মুহূর্তে আমি মুক্ত। সেই মুহূর্তেই আমি আত্মা, আমি নিখিল বিশ্বের একেশ্বর সম্রাট। যদি রাজা পাগল হয়ে আপন দেশে 'রাজা কোথায়', 'রাজা কোথায়' বলে খুঁজে বেড়ায়, সে কখনো তার উদ্দেশ পাবে না যেহেতু সে নিজেই রাজা। নিজেকে রাজস্বরূপ বলে জানো। জানো তোমার এ দারিদ্র্য সত্য নয়, এ বদ্ধতা সত্য নয়, এ খণ্ডতা সত্য নয়। যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকে সে তুমিই। তুমি যদি ঈশ্বর না হও, তাহলে ঈশ্বর কোনোদিন নেই,

কোনোদিন হবেও না। আর যদি পাপ বলে কিছু থাকে, তবে এরূপ বলাই একমাত্র পাপ যে আমি দুর্বল বা অপরে দুর্বল।'

এই বুঝি হিন্দুর বেদান্ত। মুগ্ধ হয়ে বলাবলি করে সকলে। কী সুন্দর কথা। কী শাশ্বত সত্য কথা।

'বেদান্ত জগৎকে উড়িয়ে দেয় না, জগৎকে ব্যাখ্যা করে। ব্যক্তিকে উড়িয়ে দেয় না, ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করে। আমিত্বকে বিনাশ করতে বলে না, প্রকৃত আমিত্ব কি তাই বুঝিয়ে দেয়। আপাতপ্রতীয়মানের মধ্য থেকে বার করে সত্যস্বরূপকে।'

'আমরা আবার ভারতবর্ষে মিশনারী পাঠাই!' বলাবলি করে শ্রোতার দল: 'ভারতবর্ষই পাঠাক এখানে মিশনারী।'

ধর্ম নয়, রুটি—রুটিই ভারতবর্ষের একমাত্র প্রয়োজন। কী ধর্ম তুমি ভারতবর্ষকে শেখাতে পারো, কী তোমার স্পর্ধা, তোমরা কোথায় ছিলে, ভারতবর্ষ যখন বেদান্ত দিয়েছে, যখন দিয়েছে বৌদ্ধবাদ যা হিন্দুধর্মেরই স্বাভাবিক পরিণতি। কোথায় তোমরা ছিলে যখন হিন্দু বলেছে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। সুতরাং ধর্মের কথা বোলো না, পারো তো তার কাছে রুটি নিয়ে যাও, নিয়ে যাও রুটি তৈরি করবার যন্ত্র, নিরন্নকে খাদ্য দাও, দাও তাকে খাদ্য উৎপাদন করবার বৈজ্ঞানিক উপায়। পরশাসন তাকে অজ্ঞানে-দারিদ্র্যে জর্জর করে রেখেছে, দাও তাকে সেই শেকলভাঙার সামর্থ্য। তাকে মহৎ হতে পবিত্র হতে দয়ালু হতে শোনাতে যাবার দরকার নেই। সে এমনিতেই মহৎ ও পবিত্র আছে, দয়ার সে নিত্যনির্ঝর। তাকে ক্ষুধা থেকে রোগ থেকে অশিক্ষা থেকে মুক্ত হবার মন্ত্র শোনাও—যদি সে মহত্ত্ব সে পবিত্রতা সে করুণা তোমার থাকে।

'আপনি কোথায় আছেন? আমাদের বাড়িতে থাকবেন চলুন।' কত লোক সস্নেহ অনুরোধ করতে লাগল।

'আপনাকে যদি অতিথিরূপে পাই, আমরা ধন্য হই, আমাদের গৃহ ধন্য হয়।'

'শুধু ধন্য? আমাদের গৃহ পুণ্যময় হয়ে ওঠে।'

'মন্দির হয়ে ওঠে।—আপনি যাবেন?'

দেশে চিঠি লিখছেন স্বামীজি: 'আমেরিকানদের দয়ার কথা কী বলব। জানো, আমার আর এখন এক কপর্দক অভাব নেই। আমার বাড়ি ভাড়া বা খাইখরচার জন্যে এক পয়সাও লাগে না। ভাবতে পারো? ইচ্ছে করলে এই শহরের যে কোনো সুন্দর বাড়িতে আমি থাকতে পারি। এ বাড়ি নয় তো ও বাড়ি, সব সময়েই কারু না কারু অতিথি হয়ে আছি। এত সুখ যেন কল্পনার অতীত ছিল। ইউরোপে যেতে যে আমার খরচ লাগবে, জানো, তাও আমি এখান থেকে পাব। ক্ষণে ক্ষণে বুঝছি প্রভু আমার সঙ্গে-সঙ্গে আছেন আর আমি তাঁর আদেশ পালন করবার চেষ্টা করছি। জগতের লোকের ভালোবাসার বস্তু অনেক আছে—তারা তাদের ভালো বাসুক—আমাদের প্রেমাস্পদ শুধু একজন—আর কেউ নয়, প্রভুই আমাদের একমাত্র প্রেমাস্পদ।'

ধর্মসভার প্রতিনিধিদের বাড়িতে রাখতে আগ্রহ দেখাচ্ছে অনেকে। শুধু আগ্রহ নয়, সভার কার্যালয়ে প্রত্যক্ষ আবেদন করছে কেউ কেউ। আমি স্থান দিতে পারি একজনকে, আমি একাধিক। বেশ উদারস্বভাব দেখে কাউকে পাঠাবেন, কিংবা বড় জোর একজন খৃস্টান দেশের লোক।

মিসেস জন লিয়ন, ২৬২ মিচিগান এভিনিয়ুতে থাকে, সেও একজন চেয়ে পাঠাল।

কোনো শর্ত আরোপ করে দেয়নি। ধর্মের ব্যাখ্যাতা যখন তখন নিশ্চয়ই সাধারণের বাইরে। খবর এল, তোমার বাড়িতে পাঠাচ্ছি একজনকে। বাড়ি তখন অতিথিতে ভর্তি, শহর-মফস্বল থেকে আত্মীয়স্বজন অনেকে এসেছে এই ধর্মসভার আকর্ষণে, কোনো ঘরই আর খালি নেই। এখন এই প্রতিনিধিকে জায়গা দিই কোথায় ? মিসেস লিয়ন ভাবনায় পড়লেন। দেরি নেই, আজ সন্ধ্যায়ই তো সে আসছে।

তোর ঘরটা খালি করে দে। বললেন বড় ছেলেকে।

কে আসছে ?

কই, নাম পাঠায়নি তো। যে আসুক, ঘর একখানা তাকে দিতে হবে। তুই কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নে।

কে এমন সে নবাবপুত্তুর ! ছেলে গজগজ করতে লাগল, কিন্তু মায়ের কথার অবাধ্য হল না।

আসতে-আসতে সেই মধ্যরাত্রি। ঘণ্টা শুনে দরজা খুলে দিয়ে তো সবাই বাক্যহীন। এ-কি ! স্বামী বিবেকানন্দ।

মিসেস লিয়ন স্বামীজিকে তাঁর ঘর দেখিয়ে দিলেন। এইখানে থাকবেন আপনি।

ঘর নিয়ে নয়, বাড়িতে থাকা নিয়েই আপত্তি উঠল। প্রবল, প্রমত্ত আপত্তি। আপত্তি উঠল বাড়িতে যারা আত্মীয়-বন্ধু সমবেত হয়েছে তাদের দিক থেকে। এ কালা-আদমির সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা চলবে না আমাদের। না, কিছুতেই না। হলই বা না ধর্মবক্তা কিন্তু গায়ের রঙ তো অবিমিশ্র সাদা নয়। যে করে পারো তাড়াও গেরুয়াধারীকে।

মিসেস লিয়ন মহা ফাঁপরে পড়লেন। হোমরাচোমরা সব আত্মীয়, তাদের চটানো দুঃসাধ্য। এদিকে স্বামীজিও আমন্ত্রিত। তাঁর প্রতিও বা রূঢ় হই কি করে ?

আজ রাতটা শান্ত হয়ে কাটাও সকলে। মিসেস লিয়ন আত্মীয়দের প্রবোধ দিতে চাইলেন। কাল সকালে না হয় স্বামীজিকে সামনের হোটেলে উঠে যেতে বলব।

সকালে লাইব্রেরি-ঘরে স্বামীর টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন মিসেস। মিস্টার লিয়ন খবরের কাগজ পড়ছেন।

'এখন কি করা !' মিসেসের স্বরে কুণ্ঠার কুয়াশা জড়ানো।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন না মিস্টার।

'নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনে এখন কি করে বলি হোটেলে গিয়ে উঠুন !'

'কাকে কী বলবে ?' কাগজের মধ্যে ডুবে থেকেই প্রশ্ন করলেন মিস্টার।

'স্বামীজিকে।'

'তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও।' কাগজ ফেলে দিয়ে হুঙ্কার করে উঠলেন মিস্টার।

'তাড়িয়ে দেব ?' মিসেস লিয়ন পিছিয়ে গেলেন দু পা।

'একশোবার দেবে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার : 'এ সব আত্মীয়ের মুখদর্শন করাও পাপ। এত বড় লোক, আমি পাব কোথায় ? বলে কিনা কালো ! অন্তরজ্যোতিতে কী দিব্যদীপ্তিমান পুরুষ, কার সাধ্য ওঁর সামনে এসে দাঁড়াক একবার দেখি। আগুনের আবার রঙ কি ! কী রঙ বসন্তের ! তুমি স্বামীজিকে বলো যতদিন খুশি তিনি থাকুন এ বাড়িতে আর ওঁরা, আমাদের একচক্ষু আত্মীয়েরা, যে যার পথ দেখুন, কেটে পড়ুন। আর যদি থাকতে চান মিলে-মিশে থাকুন এক আকাশের নিচে একই মাটির মত।'

মিস্টার লিয়নের এই রোষরুদ্র মূর্তি দেখে আত্মীয়েরা সমস্ত জোর খুইয়ে বসল। যাব-যাব করেও যেতে পারল না। থাকল মিলে-মিশে। ঘাড় গুঁজে। স্বামীজির উদার উপস্থিতিই ভেঙে ফেলল অন্ধ জেদের উদ্ধত প্রাচীর। এক খাবারের টেবিলে বসল সবাই পাশাপাশি। আমরা সকলেই সেই এক অমৃতের অধিকারী। এক পঙক্তির সরিক। এক ভোজ্যের ভাগীদার।

লিয়নের একটি নাতনি আছে, ছ বছর বয়স, তার সঙ্গে স্বামীজির খুব ভাব। নাম কর্নেলিয়া।

'তোমাদের দেশের গল্প বল না।' কর্নেলিয়া এসে অনুনয় করে।

'আমাদের দেশের গল্প! উঃ, সে কত বড় দেশ—জানো, কত বানর আছে সেখানে, গাছে-গাছে লাফানো পাল-পাল বানর, আর কত ময়ূর, আর ঝাঁকে-ঝাঁকে ওড়া কত সবুজ টিয়ে—যাবে তুমি আমাদের দেশে? কত বড়-বড় বট গাছ, অশ্বথ গাছ, কী সুন্দর ছায়া, কী সুন্দর কচি-পাতার শিরশির—'

যেন পরী-অপ্সরীর দেশ। কর্নেলিয়ার চোখে স্বপ্নের রঙ লাগে। বলে, 'ও কি, থামলে কেন?'

স্নেহের তুলি দিয়ে আরো কত কি ছবি আঁকেন স্বামীজি। গল্পের আনন্দে কর্নেলিয়া একেবারে স্বামীজির কোলের উপর উঠে বসেছে। বলছে, 'তোমার দেশ কোথায়?'

'তুমি তো ইস্কুলে পড়। তোমার ভূগোলের বই নিয়ে এস। দেখিয়ে দি।'

কর্নেলিয়া ভূগোলের বই নিয়ে এলে মানচিত্রে লাল জায়গাটা চিহ্নিত করলেন স্বামীজি। এই আমাদের দেশ। ইংরেজের অহঙ্কারে রক্তিম। আমাদের বেদনায় রক্তাক্ত।

'জানো, আমাদের দেশ বড় গরিব।' বললেন স্বামীজি, 'তোমার বয়সের কত মেয়ে লেখবার-পড়বার সুযোগই পায় না।' লিয়ন-দম্পতির দিকে তাকালেন: 'আমি এ দেশে শুধু আমার ধর্মের কথাই বলতে আসিনি, আমার দেশের দৈন্য কি করে মোচন করতে পারি তারও উপায় খুঁজতে এসেছি।'

ধর্মসভার একটা বিজ্ঞান-শাখা বলে বিভাগ আছে। সেখানেও বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বামীজি। নানা দুরূহ বিষয়ের উপরেই বলছেন। নৈষ্ঠিক হিন্দুত্ব ও বেদান্তদর্শন কিংবা ভারতের ইদানীন্তন ধর্ম কিংবা হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব কিংবা বৌদ্ধধর্মই হিন্দুধর্মের পরিপূর্ণ রূপ। 'হিন্দুত্ব ছাড়া বুদ্ধত্ব নেই।' বলছেন স্বামীজি, 'আবার বুদ্ধত্ব ছাড়া হিন্দুত্ব পঙ্গু। ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে মেশাতে হবে বুদ্ধকরুণা। অতীন্দ্রিয়তার সঙ্গে মানবীয়তা। দেবের সঙ্গে জৈবের গ্রন্থি।'

শুধু কি ধর্মসভায়? ধর্মসভার বাইরেও বলতে হচ্ছে স্বামীজিকে। বক্তৃতা দিয়ে পয়সা পাচ্ছেন। ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে তিনি যে মহৎ কাজ করবেন তারই উদ্দেশ্যে এ দান। তোমার দেশের লোকদের আমরা চিনি না, কিন্তু যে দেশের লোক তুমি, তার যদি কিছু উপকারে আসতে পারি আমরা থাকব না পিছিয়ে। স্বামীজির তো টাকার থলে নেই, একটা রুমালে করে বেঁধে আনেন টাকা। মিসেস লিয়নের কোলে ঝরঝর করে ঢেলে দেন। মিসেস লিয়ন তাঁকে চেনান কোনটা কোন ধরনের মুদ্রা, কোনটার কত মূল্য। তারপর একত্র করে স্বামীজির পক্ষে নিজের ব্যাঙ্কে রেখে দেন জমা করে।

'কি সুন্দর টুপি তোমার মাথায়!' কর্নেলিয়া চোখ বড় বড় করে তাকায়।

'এ টুপি কে বললে ? এ খোলা যায় আবার পাকানো যায় গোল করে।' হাসিমুখে বললেন স্বামীজি।

'তবে ফেল না খুলে।' কর্নেলিয়ার চোখে জ্বলন্ত কৌতূহল।

'খুলে ফেলব ?'

'আবার যখন পাকিয়ে জড়িয়ে নিতে পারবে তখন খুলে ফেলতে দোষ কি। দেখি না !'

'তোমার যখন ইচ্ছে—' স্বামীজি অনায়াসে খুলে ফেললেন পাগড়ি। নতুন করে কি ভাবে ফের বাঁধতে হয় শিখিয়ে দিলেন কৌশল।

'আমাদের আমেরিকার খাওয়া নিশ্চয়ই তোমার পছন্দ হচ্ছে না।' বললেন মিসেস লিয়ন. 'নিশ্চয়ই ফিকে লাগছে, হয়তো বা জোলো—'

'না, না, আমার বেশ ভালো লাগছে, একটুও অসুবিধে হচ্ছে না।' বললেন স্বামীজি, 'যখন যেমন তখন তেমন এই আমার জীবনের শিক্ষা, যে দেশে যে আচার।'

তবু স্বামীজির জন্যে এক বোতল সস্ কিনেছেন মিসেস লিয়ন যদি তিনি স্বাদে একটু বা রুচি পান।

'এই সস্ দু এক ফোঁটা আপনার মাংসের প্লেটে ঢেলে নিতে পারেন।' মিসেস লিয়ন বললেন উৎসুক হয়ে।

অঢেল হাতে বোতল উপুড় করলেন স্বামীজি।

কর্নেলিয়া তো বটেই, টেবিলের আর-সকলেও চেঁচিয়ে উঠল : 'এ কি সর্বনাশ ! এ সস্ যে ভীষণ ঝাল।'

স্বামীজি মুচকে হাসলেন। পরম আরামে খেলেন মাংসটা। সেই থেকেই খাবার টেবিলে স্বামীজির জন্যে রোজ এক বোতল সস্ রাখছেন মিসেস। যা ওদের কাছে মরণ তাই স্বামীজির কাছে ছেলেখেলা।

৫১

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তবু কিনা আমেরিকানদের কুণ্ঠা। একটু বা উন্নাসিক অবজ্ঞা।

'আপনাদের মধ্যে কজন পড়েছেন হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ ?' ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দিতে-দিতে একদিন মাঝপথে হঠাৎ থেমে পড়লেন স্বামীজি। শ্রোতাদের মধ্যে কোথাও বুঝি বা লক্ষ্য করেছেন একটু বিরাগের ভাব, একটু বা বিদ্রূপের। হুঙ্কার করে উঠলেন : 'যাঁরা যাঁরা পড়েছেন দয়া করে হাত তুলুন। তুলুন। সত্যের কাছে যাঁরা সাহসী তাঁরা পিছিয়ে থাকবেন না। অকপট হোন।'

কত গণ্যমান্য শিক্ষিত বিদগ্ধের ভিড়, কিন্তু হাত তুলল মোটে তিনজন। তেজস্বী সিংহের মত কেশর ফোলালেন স্বামীজি। তীক্ষ্ম প্রহারের মত বর্ষণ করলেন তিরস্কার। মোটে তিনজন। আর তাইতেই আপনাদের জনমত। আপনাদের বিচার করার দুঃস্পর্ধা। নিজেদের বিদ্যার বহর দেখে মাথা হেঁট করল আমেরিকানরা।

আসলে ওদের তত দোষ নেই. ওদেরকে ভুল বোঝানো হয়েছে। আর এই ভুল বোঝানোর পান্ডা হচ্ছে ইংরেজ—ভারতবর্ষের সর্বশোষণের যে অজগর। শোনো, আমার

কাছ থেকে শেখ। হিন্দুধর্মই সমস্ত বিশ্ববাসীকে অমৃতের পুত্র বলে সম্বোধন করেছে, পেরেছে করতে। তোমরা কোথায় ছিলে যখন হয়েছে সে উদার শঙ্খনাদ। তমসার পরপারে আদিত্যবর্ণ যে পুরুষ—তোমার আমার মধ্যে এক যে সেই সূর্য—তাকেই দেখেছে মুক্ত চক্ষে। আয়ত চক্ষে। শোনো আমি যা বলছি।

তোমার কথা না শুনি এ আমাদের সাধ্য কি। তুমি দুর্বার সত্যের তেজে সমুজ্জ্বল। তুমি অপ্রতিরোধ্য।

তিনি চলেন, তিনি আবার নিশ্চল। তিনি দূরে, আবার তিনি নিকটস্থ। তিনি সমস্ত জগতের অন্তরে, আবার তিনি সমস্ত জগতের বহির্ভূত। হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যস্বরূপের, সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষের মুখ ঢাকা। হে পূষন্, হে জগৎ পরিপোষক সূর্য, সত্যধর্ম, আমার উপলব্ধির জন্যে সেই আচ্ছাদন অপসারিত করো। হে মহৎ একাকী, হে নিয়ন্তা, তোমার রুদ্রতেজ সংবরণ করো, তোমার শোভনতম কল্যাণতম রূপ আমাকে দেখতে দাও। দেখতে দাও সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষও যে, আমিও সে-ই। শোনো। যে সমুদয় বস্তু সেই পুরুষে এবং সমুদয় বস্তুতেই সেই পুরুষকে দেখে সেই দর্শনের বলে তার আর কোনো ঘৃণা নেই অসূয়া নেই, নেই ভেদবুদ্ধি। সেই একদর্শীর একত্বদর্শীর কোথায়ই বা মোহ, কোথায়ই বা শোক। পূর্ণের সঙ্গে পূর্ণ যোগ করলে সমুদ্ভূতও পূর্ণ—পূর্ণের থেকে পূর্ণ বিয়োগ করলে অবশিষ্টও পূর্ণ।

আরো শোনো। বলছেন স্বামীজি, 'এ নয় যে খৃস্টান হিন্দু হোক বা বৌদ্ধ হোক, বা হিন্দু কি বৌদ্ধ খৃস্টান হোক। আসল কথা পরস্পর পরস্পরের ধর্মসৌরভ গ্রহণ করুন। নিজের-নিজের প্রাণবায়ু ঠিক রাখুক, নিশ্বাসে নিক প্রতিবেশী ফুলের সুগন্ধ। ব্যক্তিত্ব বিশুদ্ধ রেখে উদার সমন্বয়। আর এ জেনো ধার্মিকতা বা পবিত্রতা বা চিত্তের বিশালতা কোনো মঠ বা মন্দির বা গির্জের একচেটে নয়। প্রত্যেক ধর্মের পতাকাতেই এক মন্ত্র লেখা—শান্তি আর কল্যাণ, প্রেম আর মৈত্রী।'

খৃস্টান মিশনারিরা রুষ্ট হন। তাদের ভাত মারা যায় বুঝি। এতকাল তারা বোঝাতে চেয়েছে যে হিন্দুধর্ম শুধু পুতুলপুজো, এক বাণ্ডিল কুসংস্কার। বজ্র-বিদ্যুন্ময় বাত্যার মত স্বামীজি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই মতবাদের উপর, সমস্ত ধূমধূলি মেঘকুয়াশা উড়িয়ে দিয়ে উদ্ঘাটিত করলেন অখণ্ড আকাশের উদার নীলিমা। হিন্দু-ধর্মই বিশ্বজনীন, বেদান্তের হিন্দুর বসবাস শুধু দেশে নয় বিশ্বে, শুধু বা বিশ্বে নয় ত্রিভুবনে।

'আমাদের ধর্মের এক কেন্দ্রীভূত সত্য।' বলছেন স্বামীজি, 'তা এই যে মানবাত্মা অজ, অবিনাশী, সর্বব্যাপী সর্বভৌমিক। কোনো বাক্য কোনো বেদ এর মহিমা প্রকাশ করতে অক্ষম, যার সামনে অনন্ত সূর্য চন্দ্র তারকা নীহারিকা বিন্দুতুল্য। প্রত্যেক নরনারী—শুধু নরনারীই নয়, উচ্চতম দেবতা থেকে তোমার পদতলস্থ ঐ কীট পর্যন্ত সকলেই ঐ আত্মা—হয় উন্নত নয় অবনত। প্রভেদ—প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। আত্মার এই অনন্ত শক্তি জড়ের উপর প্রয়োগ করলে ভৌতিক উন্নতি হবে, চিন্তার উপর প্রয়োগ করলে মনীষার বিকাশ হবে আর নিজের উপর প্রয়োগ করলে মানুষ ঈশ্বর হয়ে উঠবে। জড় আমাদের লক্ষ্য নয়, চৈতন্যই আমাদের লক্ষ্য। আর মানুষকে ঈশ্বর করার ধর্মই হিন্দুধর্ম।'

আর তোমরা, পাদ্রীরা, এসব কী কাণ্ড করছ বল দেখি। তোমাদের দেশের

ছেলেমেয়েদের স্কুলপাঠ্য বইয়ে ছবি ছেপেছ যে হিন্দু মা তার সন্তানকে গঙ্গার কুমিরের মুখে নিক্ষেপ করছে। আর বলিহারি তোমাদের রুচি, মাকে কৃষ্ণকায়া করে তার শিশুকে করেছে শ্বেতাঙ্গ। যাতে সহজেই তোমাদের দেশের লোকের সহানুভূতি জাগে ঐ শিশুর উপর। হিন্দু তার শত্রুদের পীড়ন করতে চায়—তাই ছবি ছেপেছ, সেই হিন্দু তার স্ত্রীকে এক খুঁটিতে বেঁধে পোড়াচ্ছে যাতে তার ঐ স্ত্রীর ভূত শায়েস্তা করতে পারে শত্রুদের। সেদিন আর এক বইয়ে দেখলাম এক পাদ্রী সাহেব তাঁর কলকাতা-দর্শনের বিবরণ দিচ্ছেন। লিখছেন কলকাতার রাস্তা দিয়ে রথ যাচ্ছে আর তার চাকার নিচে পড়ে পিষ্ট হবার জন্যে লাফিয়ে পড়ছে ধর্মোন্মত্ত জনতা। এ সব গাঁজাখুরি পেলে কোথায়? মেমফিস শহরে সেদিন এক পাদ্রী বললেন, ভারতবর্ষের প্রত্যেক গ্রামে শিশুদের কঙ্কালে পরিপূর্ণ একটা করে পুকুর আছে। এ সবের মানে কী? খৃস্টশিষ্যদের হিন্দুরা কী করেছে যে প্রত্যেক খৃস্টান ছেলেমেয়েদের শোনানো হবে হিন্দুরা মন্দ, হিন্দুরা দুষ্ট, পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুরা জঘন্যতম জীব, এক কথায় বর্বর বিশেষ। যাতে ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষার্থীরা চাঁদা দেয় মিশনে, হিন্দু-উদ্ধারে। হিন্দুদের ধর্মব্যাপারে শিক্ষিত-সংস্কৃত করতে না পারলে যেন তাদের ঘুম নেই, ঘুচবে না মাথাব্যথা। কিন্তু আমি এসব হেঁট মাথায় মেনে নেব না কিছুতেই, সবলে ছিন্ন করব সব মিথ্যার কুয়াশা। চোখে চোখ রেখে আমাকে দেখ, কান পেতে শোনো আমার কথা—আমিই সমস্ত মিথ্যার জাগ্রত প্রতিবাদ, অভ্রান্ত সত্যের জ্বলন্ত উপস্থিতি।

'হ্যাঁ, বলো, আমাকেও আমার মা জলে কুমিরের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন', স্বামীজি বলছেন শ্লেষ করে, 'আর আমি তোমাদের বাইবেলের জোনার মত আবার পারে উঠে এসেছি।'

যীশুখৃস্ট শিরোধার্য, কিন্তু তাঁর নামে যে মারামারি কাটাকাটি করছ, দেশে-বিদেশে জ্বালিয়েছ যে নির্যাতনের আগুন, তাতে তার মুখ প্রশান্ত বা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কি? যদি আজ এখানে তিনি থাকতেন মাথায় দিয়ে শোবার জন্যে এক-টুকরো পাথর পেতেন কিনা সন্দেহ।

'কী যীশুর ধর্ম তা আমার কাছ থেকে শোনো।' খৃস্টধর্মের প্রেম আর ভক্তির কথা বলতে লাগলেন স্বামীজি।

'তুমি এত কথা, খৃস্টধর্মের আদর্শের কথা, কী করে জানলে?' এক ধর্মযাজক জিগগেস করলেন স্বামীজিকে।

স্বামীজি হাসলেন। বললেন, 'যীশু যে প্রাচ্যের লোক। আমারই দেশবাসী। তাঁর কথা আমি ভালো জানব না তো আর কে জানতে পারবে?'

শোনো, যারা ভয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসে তারা অধম, অক্ষম, অপরিণত। ঈশ্বর এক প্রচণ্ড পুরুষ, তাঁর এক হাতে দণ্ড আর এক হাতে চাবুক, তাঁর কথা না শুনলে শাস্তি পেতে হবে, তারই জন্যে তাঁকে উপাসনা করব? কিংবা তাঁর আদেশ পালন করলে জুটবে কিছু পার্থিব সুখ সেই লালসায়? আমি কি ভিক্ষুক না কি আমি ক্রীতদাস? আমি প্রেমী। আমি সমর্থ, আমি কৃতার্থ, আমি পরিপূর্ণ। আমার ভালোবাসায় কেনা-বেচা নেই, আমি দোকানদারি করতে বসিনি। একটা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তাকে ভালোবাসলাম, সে কি আমার কাছে কিছু চায়, না, আমিই কিছু প্রার্থনা করি তার কাছে? তবু তাকে দেখে আমার কত আনন্দ কত শান্তি কত প্রসাদ, আর মনের কোণে

কোথাও যদি এতটুকু ভয় থাকে, ভালোবাসাই তো পারে তা দূর করতে। পথিপার্শ্বে তরুণী মা দাঁড়িয়ে আছে, একটা কুকুর ডাকলেই সে ভয় পেয়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে। কিন্তু যদি তার শিশু তার সঙ্গে থাকে আর যদি কোনো সিংহ এসে তার শিশুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সেই মা কোথায় যাবে মনে করো? তার ঘরে, না, সিংহমুখে? অবশ্যই সিংহমুখে, যেহেতু প্রেম তাকে নির্ভয় করেছে, পরিণামের কথা ভাববারও সময় দেয়নি। আর এই সে প্রেম যার বিকল্প নেই, যার জন্য আর দ্বিতীয় পাত্র নেই। যাকে ভালোবাসা মানেই সকলকে ভালোবাসা।

পাদ্রীরা যদি বা ক্ষান্ত হয়, স্বদেশের লোকই শত্রুতায় মাতে। আর এ যে-সে লোক নয়, ধর্মনেতা, শিকাগোর সভায় বক্তা সেজে এসেছে। নিজে বিশেষ কল্কে পায়নি বলেই স্বামীজির প্রতি ঈর্ষা। চাল নেই চুলো নেই কোথাকার এক যুবক সন্ন্যাসী এসে মুহূর্তে তাঁর ও তাঁর দলের জাঁক ভেঙে দিল, এ অসহ্য। স্বামীজির পূর্ববৃত্তান্ত জানেন কিছু? কর্তৃপক্ষ উৎসুক হয়ে জিগগেস করল সেই লোকটিকে। জানি না? খুব জানি। ধর্মনেতা মনের সুখে ঝাল ঝাড়ল। ও একটা ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে। ভারতবর্ষে ওকে কেউ চেনে না, নামও শোনেনি কোনোদিন। লোক ঠকানোই ওর ব্যবসা, সন্নেসীর ভেক ধরে এখন এসেছে বিদেশে।

না, না, এ আমরা মানতে প্রস্তুত নই। চোখের সামনে দেখছি যে ভাস্বর মূর্তি। নবোদিত সূর্যের মত সুন্দর, যার মুখে এমন সত্যস্বচ্ছ কথা, দুই চোখে অগাধ আহ্বান, জ্যোতির্ময় আনন্দধামের সঙ্কেত, তাকে প্রতারক বলি কি করে, কি করে বলি এ সব শুধু অভিনয়? অগ্নিময় আন্তরিকতাকে কি স্পর্শমাত্রই চেনা যায় না? এ এক দৈবী দীপ্তি। দৈবী দীপ্তি ছাড়া এ কিছু নয়।

তবু দেখা যাক আরো পরীক্ষা করে।

'আমাকে লোকে উপহাস করেছে, অবজ্ঞা করেছে, বদমাস জোচ্চোর বলেছে, আর তাদের কথা ভেবেই সব সহ্য করছি।' লিখছেন স্বামীজি: 'এ জগত দুঃখের আবাস কিন্তু আবার তা শিক্ষার মন্দির। এ দুঃখ থেকেই আহরণ করি সহিষ্ণুতা, অদম্য ইচ্ছাশক্তি যে শত বিপদে-বৈফল্যেও মানুষকে নিষ্কম্প রাখে। যারা আমাকে ভণ্ড বলে তাদের কোনো দোষ নেই। তারা ক্ষুদ্রচেতা, ক্ষীণদৃষ্টি—পানাহার, অর্থোপার্জন, আর বংশবৃদ্ধি—এই নিষ্প্রাণ নিয়মে তারা আবদ্ধ। তাদের কাছে যেও না। যারা ধনী, গণ্যমান্য, উচ্চপদাসীন, তাদের জীবনীশক্তি নেই, তারা মৃত-কল্প, তাদের ভরসা রেখো না। ভরসা শুধু তোমাদের উপর, যারা পদমর্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু উদ্দীপ্ত-বিশ্বাসী। বৎস, কোনো কৌশলের প্রয়োজন নেই। কৌশলে কিছুই হয় না। দুঃখীদের জন্যে প্রাণে-প্রাণে কাঁদো আর ভগবানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। সাহায্য আসবেই আসবে। যে আন্তরিক হয় কিছুই আর তার অন্তরালে থাকে না।'

অনেক সুন্দরী আমেরিকান মেয়ে স্বামীজির বন্ধুতার জন্যে ভিড় করেছে। তাদের কারু কারু বা ইচ্ছে স্বামীজিকে সংসারপথে টেনে নিয়ে যায়, ভ্রষ্ট করে সন্ন্যাসধর্ম থেকে। তার জন্যে মিসেস লিয়নের খুব দুশ্চিন্তা। লোকব্যাপারে অনভিজ্ঞ, সর্বদা অন্যমনস্ক, শিশুর মত সহজনির্ভর, আকস্মিক কোনো ভুল করে না বসে। গেলেন তিনি স্বামীজিকে সতর্ক করতে, মায়ের স্নেহ উদ্বেগে।

মায়ের উদ্বেগের উত্তরে স্বামীজি বললেন, 'মা, আমার আমেরিকান মা, আমার জন্যে

ভয় করো না।' গদগদগাঢ়স্বরে বললেন স্বামীজি, 'এ সত্যি, আমি মুক্ত প্রান্তরে গাছের তলায় শুয়ে রাত কাটাতেই অভ্যস্ত, কিন্তু মাঝে মাঝে আমি রাজপ্রাসাদে পালঙ্কে শুয়েও ঘুমিয়েছি আর রাজার আদেশে তার দাসী সারারাত ময়ূরপুচ্ছের পাখা দিয়ে আমাকে ব্যজন করেছে। আমার ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয়নি। প্রলোভনে আমার ভয় নেই—গুরু আর গেরুয়াই আমার রক্ষাকবচ।'

'গেরুয়া ?'

'হ্যাঁ, গেরুয়াই তো বিলাসব্যসন আর কামকাঞ্চনের প্রতিষেধ। আজ যদি গেরুয়া জগতে না থাকত তাহলে ভোগলালসা পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্যত্ব হরণ করে নিত।'

'আর গুরু ?'

'হ্যাঁ, আমার পরম গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সব সময়ে আমার সঙ্গে-সঙ্গে আছেন। আমি যতক্ষণ তাঁর ইচ্ছায় খাঁটি আছি কারু সাধ্য নেই আমাকে বশীভূত করে বা আমার প্রতিবন্ধক হয়। আমি যদি সংসারত্যাগ না করতাম তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ যে বিরাট সত্য প্রচার করতে জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা প্রকাশিত হত না। আমার গুরুদেবের সত্যই রাখবে আমাকে সত্য পথে, অকম্প পবিত্রতায়।'

দৃঢ়ব্রত সর্ববন্ধনির্মুক্ত স্বামীজি। বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি নেই কিছুতেই। বিমলবোধ শিশু, তন্তুতে তন্তুতে সাধু, অকৃত্রিম সারল্যের অমিয়নির্ঝর। আত্মার অভিঃমন্ত্রের উদ্ভাসক, অদ্বৈত বেদান্তঘন দেহ, কে তাতে ছায়া ফেলে! অখিল ধর্মের অধীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের কর্মমূর্তি—কে তার কাছে ঘেঁষে! শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপ্রসূতা আধ্যাত্মিক গঙ্গা যে বইয়ে দিয়েছে তাকে দেখা মাত্রই ধুয়ে যাবে অস্বাস্থ্য। উত্থিত হবে প্রার্থনা, হে নির্মলকান্তি, তোমার প্রবাহে আমার সমস্ত পাপ আর দ্রোহ, দ্বেষ আর অনৃত ভাসিয়ে নিয়ে যাও। অবিদ্যাকে নিঃশেষ-নির্মূলিত করো। ক্ষুদ্রসত্তা থেকে মুক্তি দাও।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন স্বামীজি। যারা প্রলুব্ধ করতে এসেছিল প্রণত হল পদপ্রান্তে। সকলে বুঝল পরাক্রান্ত মহান সূর্যের মতই একা-একা ভ্রমণ করছেন স্বামীজি। চোখে চরম জ্ঞানের জ্যোতি, জিহ্বায় উপনিষদ, মুখমণ্ডলে বুদ্ধের শান্তি, যীশুখৃস্টের প্রেম। আর কারু সংশয় নেই, এ লোক ঈশ্বরের প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট আধিকারিক পুরুষ। ঊর্ধ্বহস্তে শুধু কৃপা আর অভয়। কণ্ঠস্বরে পরম সত্যের বজ্রনির্ঘোষ, কখনো বা করুণার জলপ্রপাত। আর সমস্ত উপস্থিতিই উদার বন্ধুতায় উচ্ছ্বসিত।

'মা, আমার আমেরিকান মা, আমার এক জায়গায় শুধু প্রলোভন!' বললেন স্বামীজি।

'কোথায় ?' মিসেস লিয়নের চোখে ভয়ের আভাস।

'কোনো মানুষ নয় মা ' স্বামীজি হাসলেন: 'আমার প্রলোভন আমেরিকার এই বলিষ্ঠ সংগঠনে। সর্বত্র বিরাটের যজ্ঞে বিরাটের নিমন্ত্রণ।'

শুধু তাই ? দয়া নয় ? ভালোবাসা নয় ? নয় অজস্র উদার অভ্যর্থনা ? যে দরজায় গিয়ে দাঁড়ান সে দরজাই খুলে যায়। যার চোখের দিকে তাকান সেই আলোর জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠে। কেন ? আমেরিকানদের মধ্যে ধর্মের প্রবণতা প্রবল বলে।

কিন্তু চতুর্দিকে এত খ্যাতি আর যশকীর্তন, বিলাসবিচিত্র সমাদর—স্বামীজি নিরালায়

কাঁদতে বসলেন। আমি। বিবিক্তসেবী সন্ন্যাসী, আমার স্বাধীনতা গেল, আমি পত্র-পত্রিকার মুখাপেক্ষী হলাম। আর যেখানে আমার দেশের লোক না খেয়ে মরছে সেখানে আমার সুখসৌভাগ্যভোগ অসহ্য। হে ঈশ্বর, তবু জানি তোমার অনন্ত শক্তিই আমার রক্ষক, তাই আমাকে নির্ভয়-নির্বিচল রাখবে। লিপ্ত হতে দেবে না, মুগ্ধ হতে দেবে না। বিরত হতে দেবে না।

৫২

ফরাসিনী গায়িকা এমা কালভে তখন শিকাগোতে। মেট্রোপলিটান অপেরা কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গান গাইতে এসেছে। এর আগে মাতিয়ে দিয়েছে নিউইয়র্ক, তারো আগে ইউরোপ। যে শহরেই গিয়েছে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে—সুরের আগুন। ঝড় তুলে দিয়েছে—সুরের ঝড়। লালসাবাসিনী বিলাসিনী কালভে। ঝড়ের মতই দুর্দান্ত। আগুনের মতই লেলিহান। একটি মাত্র মেয়ে, তারই উপর তার যাবজ্জীবনের ভালোবাসা। সেও এসেছে মায়ের সঙ্গে। একদিন, কেন কে জানে, অপেরায় যেতে তার মন উঠছে না—সন্ধে থেকেই মনে কেমন বিষাদের ছায়া। কারণ কি? কোনো কারণই তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অকারণে খারাপ হয় না মন? তা হোক, তাই বলে গান গাইবে না থিয়েটারে? সেদিন প্রথম অঙ্কে কী অপরূপ সুন্দর গান গাইল কালভে। প্রথম অঙ্কটা দারুণ জমল। যেন একটা জ্বলন্ত আনন্দের বন্যা খেলে গেল। হাততালি আর থামতে চায় না।

বিরতির সময় কালভের মনে হল বুক কাঁপছে, চোখে ঝাপসা দেখছে, দেহে-মনে নেমে এসেছে অকাল ক্লান্তির মালিন্য। ঠিক করলে নামবে না আর দ্বিতীয় অঙ্কে। ম্যানেজার বিপদ দেখল। কী হয়েছে তোমার? কারণ কিছু বলা যায় এমন তো দেখি না চোখের উপর। তবে গাইবে না কেন? গাইব, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুবে তো! সত্যি, আমার কী হয়েছে, কেন আওয়াজ বেরুবে না? দ্বিতীয় অঙ্কেও নামল কালভে। পরিপূর্ণ কণ্ঠে গান গাইল। গান শেষে নিজের সাজঘরের দিকে ছুটে গেল, মূর্ছিতের মত ভেঙে পড়ল চেয়ারে। ম্যানেজারকে বললে, ঘোষণা করে দিন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, নামব না শেষ অঙ্কে। কী সর্বনাশ, একটা না হয় ডাক্তার ডাকি। না, ডাক্তার ডাকতে হবে না, ডাক্তার কী করবে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল কালভে, অন্যের কাঁধ ধরে-ধরে এগুলো রঙ্গমঞ্চের দিকে। হ্যাঁ, তৃতীয় অঙ্কেও গাইল সে, আর এমন গাইল যেমনটি কোনোদিন শোনেনি শিকাগো। উত্তাল জয়ধ্বনি করতে লাগল সবাই। জয়ধ্বনির প্রত্যাভিবাদন করবার জন্যে দাঁড়াল না কালভে। চোখে মুখে অন্ধকার দেখছে সে, কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে—তার জন্যে যেন আর আলো নেই হাওয়া নেই। তাড়াতাড়ি সে ছুটে এল তার সাজঘরে—কিন্তু এ কি, ঘরে এরা সব কারা দাঁড়িয়ে আছে ভিড় করে। ম্যানেজার নিজে, আর আরো সব তার থিয়েটারের লোক। সকলের মুখ গম্ভীর, শোকচ্ছায়াচ্ছন্ন। যা কালভের মনে ডাক দিয়েছিল, নিশ্চয়ই কোনো দুর্বিপাক উপস্থিত।

তোমার মেয়েটি মারা গেছে। তোমার যে বন্ধুর বাড়িতে তাকে রেখে তুমি এখানে এসেছিলে গান করতে, সেই বন্ধুর বাড়িতে আগুনে পুড়ে মারা গেছে সে। সে পুড়েছে

আর তখন তুমি গান গাইছ, গেয়ে চলেছ। কালভে মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। তারপর কালভের জীবনে এল এক উন্মাদ পরিচ্ছেদ। স্থির করল আত্মহত্যা করবে। তার অন্তরঙ্গ বান্ধবীর কাছে জানালে তার সংকল্প।

বান্ধবী বললে ব্যাকুল হয়ে, 'তুমি স্বামীজির সঙ্গে দেখা করবে?'

'কে স্বামীজি?'

'শোনোনি তাঁর কথা? পড়োনি কাগজে? সেই এক কল্যাণবন্ধু হিরণ্ময় পুরুষ। দেখবে চলো তাঁকে। তাঁর কাছে বলবে তোমার দুঃখের কথা।' বান্ধবী গাঢ় হল নিভৃতিতে: 'তিনি আমার বাড়িতেই আছেন।'

'না, ওসবে আমার স্পৃহা নেই।' যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখে কালভে বললে, 'আমি নদীর জলে ঝাঁপ দেব। জলে ডুবে না মরলে আমার গায়ের জ্বালা, আমার মেয়ের গায়ের অগ্নিদাহের জ্বালা নিভবে না।'

বারে-বারে অনুরোধ করছে বান্ধবী, বারে-বারে প্রত্যাখ্যান করছে কালভে। তিন-তিনবার নদীর দিকে চলল কালভে, আশ্চর্য, তিন-তিনবারই পথ ভুল করল। এ কি, এ সে কোন পথে এসে পড়েছে। এ যে তার বান্ধবীর বাড়ির দিকের রাস্তা। তিন-তিনবারই নদীর বদলে বান্ধবীর বাড়ি। বারে-বারেই সে একটা মোহের থেকে উঠে আসছে বুঝি। তবে কি স্বামীজিই তাকে ডাকছেন? কোথাকার কে স্বামীজি! প্রতিবারেই ব্যর্থের মত বাড়ি ফিরে এল কালভে। এবার, চতুর্থবার, ঠিক-ঠিক সে নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছুবে। একেবারে নদীর অভ্যন্তরে। এবার আর সে পথ ভুল করবে না। ভুল করলেও পথের মাঝেই সংশোধন করে নেবে। আর ফিরবে না বাড়ি। এবার একেবারে বান্ধবীর বাড়ির সদরদরজায় গিয়ে পৌঁছুল। বাটলার খুলে দিল দরজা। মন্ত্রচালিতের মত কালভে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে, ডুবে গেল চেয়ারে।

বান্ধবী এসে বললে, 'পাশের ঘরে স্বামীজি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। চলো। তাঁর সামনে দাঁড়াও গিয়ে নীরবে। তিনি যতক্ষণ কথা না বলেন স্তব্ধ হয়ে থেকো। দেখো সেই মহিমাময়ের সান্নিধ্যে, স্তব্ধতায়, কী শান্তি, কী সুধা!'

'না' করতে পারল না কালভে। পাশের ঘরে ঢুকল সে। ধীর পায়ে নম্র নির্মল মুখে স্বামীজির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কেবল দেখল নতচক্ষে ধ্যানের মৌনে বসে আছেন এক প্রশান্ত পুরুষ। মাথায় পাগড়ি, গায়ে গেরুয়ার ঢেউ। সমস্ত ইন্ধন দগ্ধ করে ফেলা নির্ধূম আগুন। আগুন হয়েও অমৃতের সেতু।

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন স্বামীজি। কালভের মুখেও কথা নেই।

চোখ তুললেন স্বামীজি। বললেন, 'বৎসে, দুরন্ত ঝড়ের মধ্যে তুমি আছ। কিন্তু ঝড়ের মধ্য থেকেই তোমাকে তোমার শান্তি কুড়িয়ে নিতে হবে। শান্ত হও। শান্ত হওয়াই জীবনের সমস্ত প্রশ্নের যথার্থ প্রত্যুত্তর। বোসো।'

সামনে টেবিল রেখে বসেছিলেন স্বামীজি, টেবিলের ও-পারে বসল কালভে।

স্নেহভরা স্বরে স্বামীজি বলতে লাগলেন কালভের অতীত জীবনের কথা। এমন সব খুঁটিনাটি ব্যাপার যা তার নিভৃততম বন্ধুরেও জানবার কথা নয়। কী ভীষণ, এ যে প্রায় অলৌকিক কাণ্ড।

'সে কি, আমার সম্বন্ধে এত কথা আপনি জানলেন কোত্থেকে?' কালভে বিস্ময়ে প্রায় পাথর হয়ে গেল: 'আমার এ বান্ধবীরও তো এসব জানবার কথা নয়। আর তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া—' স্বামীজি মৃদু-মৃদু হাসলেন।

'তা ছাড়া এই সব গোপন কথা, লোকচক্ষুর আড়ালে ব্যক্তিগত কথা, এ সবই বা আপনার সঙ্গে কে আলোচনা করতে যাবে—'

আমি না জানি তো আর কে জানবে—এমনি উদার সহানুভূতির চোখে তাকালেন স্বামীজি। যারা আর্ত, যারা শান্তির পিপাসু, তাদের সমস্ত ইতিহাস, যন্ত্রণার ইতিহাসে, আঘাত-অপমানের ইতিহাস, সব আমাকে জেনে নিতে হবে—তারা যদি দুঃখে বা লজ্জায় তা প্রকাশ করতে না চায়, আমাকেই ডুব দিতে হবে অতীতের সমুদ্রে, চিকিৎসক যদি রুগীকে না জানে তা হলে সত্যিকার উপশম দেবে কোত্থেকে?

'কেউ আমাকে কিছু বলেনি, কারু সঙ্গে আলোচনাও হয়নি এ নিয়ে।' স্বামীজি সান্ত্বনাপরিপূর্ণ চোখে তাকালেন কালভের দিকে : 'আমি তোমাকে, তোমার জীবনকে, আগাগোড়া উদ্ঘাটিত দেখতে পাচ্ছি। খোলা বইয়ের মত পড়তে পাচ্ছি সমস্ত পৃষ্ঠা তুমি চঞ্চল হয়ো না। স্থির হয়ে বোসো তোমার আসনে।'

স্থির হয়ে বোসো তোমার আসনে—সমস্ত সমস্যার কী নিটোল সমাধান!

অন্ধকারের পরপারে এ কে উন্নত-উজ্জ্বল পুরুষ। ক্ষমা স্নেহ ও সমত্ববুদ্ধির ঔদার্য—কে এ মাধুর্যের অখণ্ড-ভাণ্ডার। কোলের উপর দুখানি হাত রেখে স্থির হয়ে বসে রইল কালভে। বিরাটের সান্নিধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেও জীবনের জ্বর চলে যায়। শোক চলে যায়, পাপ চলে যায়, পিপাসাও চলে যায়। এ কে আনন্দঘন বিজ্ঞানঘন নির্লেপ-নিরাময় পুরুষ। বিরজ, বিশোক, বিজর, বিমৃত্যু। মালিন্যরহিত, শোকরহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত আকাশাত্মা। এমন এক আনন্দ আছে যা জানলে আর ভয় থাকে না, স্বামীজি যেন সেই আনন্দ। স্বপ্রকাশ সৎ-বস্তু। অতলগহন শান্তি পেল কালভে। পেল শেষ সদুত্তর। বলিষ্ঠ আশ্রয়। অভয় প্রতিষ্ঠা। আত্মহত্যার ইচ্ছা মুছে গেল মন থেকে।

ফিরে যাবার সময় আবার তাকে মনে করিয়ে দিলেন স্বামীজি : 'ভুলো না কী বললাম। প্রফুল্ল থাকো, সর্বদা ও সর্বত্র আনন্দ বিকিরণ করো। স্বাস্থ্য ভালো করো, ভালো রাখো। নিজের দুঃখ নিয়ে ঘরের কোণে অন্ধকারে বসে থেকো না। তোমার কল্পনা ও আবেগকে একটা শাশ্বত প্রকাশের আবেগে রূপায়িত করো। তোমার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্যে তা দরকার। দরকার তোমার আর্ট, তোমার শিল্পসাধনার জন্যে।'

সমস্ত অস্তিত্বের ক্ষত যেন আরোগ্যরসায়নে প্রক্ষালিত হয়ে গেল। নিশ্চেতন উজ্জীবিত হয়ে উঠল উৎসাহে। জীবনই সেই অমিত উৎসাহ। কোনোরকম মন্ত্রমোহ বা ইন্দ্রজাল রচনা করে নয়, শুধু তাঁর বীর্যবান ব্যক্তিত্বের পবিত্রতায় তাঁর জ্বলন্ত জ্ঞানের উচ্চারণে কালভেকে স্বামীজি অভিভূত করে ফেললেন। হাসতে খেলতে নাচতে গাইতে আবার শুরু করল কালভে, আবার হয়ে উঠল সে জীবনানন্দিনী নির্মল নদী। কিন্তু এবার, এখন, এ জীবনে তার কত শান্তি কত স্থৈর্য কত নম্রতা। কত অসঙ্গ স্পর্শ। কত সুবিশাল উন্মোচন।

গরিবের ঘরে জন্ম কালভের। কী অমানুষিক পরিশ্রমে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে দুর্দিনের সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে প্রস্ফুটিত করেছে। কঠিন শিলা থেকে মুক্তি দিয়েছে শিল্পকে। যেমন রূপ তেমনি যৌবন তেমনি দৈব কণ্ঠের মাধুরী। সমস্ত পশ্চিমের

গায়িকাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা বর্ণনা করছেন স্বামীজি। আরো কত গায়ক-গায়িকা আছে কিন্তু কালভের মত কেউ নয়, না বিত্তে না বিদ্যায়। শুধু সংগীতে নয়, ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে সে অগ্রগণ্য। দুঃখ ও দারিদ্র্যের মত কেউ নেই এমন শিক্ষাদাতা। দুঃখ ও দারিদ্র্যই খুলে দিয়েছে জীবনের দুই বাতায়ন। এক মৈত্রী, দুই অনহঙ্কার। দুই খোলা জানলা দিয়ে এসেছে মাধুর্যের হাওয়া। মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। তাকিয়ে দেখ বাইরে। নিরবচ্ছিন্ন মুক্তাকাশ। ঐ আকাশ না থাকলে কে প্রাণধারণ করত সংসারে! সমস্ত আকাশই মধু।

মঠে ফিরে এলে স্বামীজিকে চিঠি লিখল কালভে। স্নেহোৎসুকা কন্যার প্রশ্ন, সামান্য প্রশ্ন: বাবা, তুমি কেমন আছ, কোথায় আছ, কি করছ, কি করবে ভাবছ।

স্বামীজি লিখছেন কালভেকে: 'আমি অনেকটা ভালো আছি। যতটা আশা করেছিলাম তার তুলনায় অবশ্যি কিছু নয়। নিরিবিলি থাকবার একটা প্রবল আগ্রহ আমার হয়েছে। আমি চিরকালের মত অবসর নেব। আর কোনো কাজ আমার থাকবে না। যদি সম্ভব হয় তো আবার আমার পুরোনো ভিক্ষাবৃত্তি শুরু হবে।'

চরকির মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন স্বামীজি। এ শহর থেকে ও শহর, এ প্রতিষ্ঠান থেকে ও-প্রতিষ্ঠান। একটা লেকচার-ব্যুরোর সঙ্গে তাঁর চুক্তি হল, তাঁকে সারা আমেরিকা বক্তৃতা দেবার জন্যে ঘোরানো হবে যার বিনিময়ে তাঁকে দেওয়া হবে দক্ষিণা—উপযুক্ত দক্ষিণা। টাকা পেলে কত লোকহিতকর কাজ করা যায় ভারতবর্ষে। কত বিভব বিলাস, বিত্ত-প্রতিপত্তির দেশ এই আমেরিকা, আর ভারতবর্ষে শুধু নিঃস্ব-নিরন্নের ভিড়। কত বড়-বড় প্রাসাদ এখানে আর ভারতবর্ষে পর্ণকুটির নয়তো গাছতলা। কিন্তু যাই বলো, ভারতবর্ষের ছাইমাখা কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর যে আত্মিক মহত্ত্ব, যে প্রদীপ্ত সভ্যতা, তার লেশমাত্রও এখানে নেই। এদের বাহ্যিক সভ্যতার বিস্তীর্ণ আচ্ছাদনের নিচে যা আছে তাইই ছাই। অন্তরে এরাই নিঃস্ব, অমৃতান্নহীন।

ফরমায়েস-মত লৌকিক বিষয় কী বলব, ভারতবর্ষের নারী, হিন্দুর প্রথা-পদ্ধতি বা বর্ণবৈষম্য—আমাকে ধর্মের কথা বলতে দাও, বলতে দাও আমার গুরুর কথা।

মাস্টার মশায়ের কথা মনে পড়ল বুঝি স্বামীজির। ঠাকুরের ঘরে ঠিক বিকেল-বেলাটিতে এসে হাজির হয়েছে। নরেন ঠাকুরের কাছে বসে, এক পাশে ভবনাথ। ঠাকুর হেসে বলছেন, একটা ময়ূরকে বেলা চারটের সময় আফিং খাইয়ে দিয়েছিল। তারপর দিন ঠিক চারটের সময় ময়ূরটা এসে উপস্থিত। আফিঙের মৌতাত ধরেছিল, ঠিক সময়ে আফিং খেতে এসেছে।'

ঈশ্বর-কথার মত কথা নেই। ঈশ্বর-প্রেম 'কলসে-কলসে ঢালে তবু না ফুরায়।' কে তোমার গুরু?

. গ্রাম্যভাষায় কথা বলা সে এক পরমসুন্দর সদানন্দ পুরুষ। দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁকে দেখে আক্ষেপ করে বলছেন, আমরা কেবল পড়েছি, আর ইনি না পড়েই সেই বেদ-বেদান্তের ফল। আমরা কেবল ঘোল খেয়েছি আর ইনি মাখন খেয়েছেন।

তোমাদের যীশু পিতা-পিতা করে পাগল। আর আমার গুরু মা-মা করেন। বলেন, বাপের চেয়ে মায়ের টান বেশি। বাপের চেয়ে মায়ের উপর বেশি জোর খাটে। মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা হলে মা মামলা ছেড়ে দেয়, হেরে যায়।

ঈশ্বর কি একটা ভাবের বুদ্বুদ? নাকি দুর্বল মানুষের কল্পনার রামধনু? ঈশ্বর

এক বিজ্ঞানের ব্যাপার, এক বিজ্ঞানসম্মত প্রতিপাদিত্য সত্য। আমাদের জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের অগ্রে ও পশ্চাতে এক অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে। আমাদের এই ব্যক্ত জগৎ এক অব্যক্তের অংশ মাত্র। বলবে, অনন্ত অজ্ঞাতকে জানবার চেষ্টা কেন? যেটুকু জ্ঞাত সেটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেই তো চলে। তাই বা চলে কই? জানব না-জানব না করেও দিনে দিনে আমরা জেনেই ফেলেছি, কিছুতেই অল্পকে নিয়ে পরিমিতকে নিয়ে স্থির থাকতে পারছি না। জ্ঞানের চরম বিষয়ই যে সেই অনন্ত অজ্ঞাত, অনন্ত অব্যক্ত, আমাদের জ্ঞানের অগ্রগমনে তাই ইঙ্গিত করছি অহরহ। যে অব্যক্তের অংশ এই ব্যক্ত জগৎ, যে অনন্ত সত্তার ক্ষুদ্র প্রকাশ এই জীবসত্তা, তাকে না জানলে এই জীব-জগতের ব্যাখ্যা হবে কি করে? সুতরাং জগদতীত সত্তার তত্ত্বানুসন্ধান না করে উপায় নেই।

বলছেন স্বামীজি: এথেন্সে বক্তৃতা করছেন সক্রেটিস। ভারত থেকে এক ব্রাহ্মণ এসেছে গ্রীসে, তাকে বলছেন সক্রেটিস, মানুষকে জানাই মানুষের সেরা কাজ। মানুষই মানুষের সর্বোচ্চ আলোচনার বস্তু।

ব্রাহ্মণ বললে, 'ঈশ্বরকে না জানলে মানুষকে জানবেন কি করে? যতক্ষণ ঈশ্বর অজানা ততক্ষণ মানুষও অজানা।'

সেই অনন্ত অজ্ঞাত বা নিরপেক্ষ সত্তা এবং অনন্ত অব্যক্ত বা নামাতীত বস্তুই ঈশ্বর। যে কোনো জড়বস্তু নিয়ে বিচার করো, তার তত্ত্বানুসন্ধানে অগ্রসর হও, দেখবে স্থূলে ক্রমশঃ সূক্ষ্মে এসে পৌঁছুচ্ছে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতরে, অণু অণীয়ানে। সর্বশেষে সূক্ষ্মতমে, অণিষ্ঠে। তখন আর জড় নেই, চলে গিয়েছে চেতনে। এবং চেতন থেকে মহত্তম পরতম শক্তিতে। আর তখন পদার্থবিদ্যা নেই। পদার্থবিদ্যা উপনীত হয়েছে দর্শনে।

জগদতীত সত্তার অনুসন্ধানই ধর্ম। আর এই ধর্মই মানুষকে পশুর থেকে আলাদা করে রেখেছে। যদি ধর্ম চলে যায়, যদি শুধু বর্তমান অস্তিত্বের মুহূর্ত-মাত্রকেই নিয়ে আমরা তৃপ্ত থাকতে চাই, তা হলে মানুষকে পশুর ভূমিতে নেমে পশুর সংজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। এই ধর্মই মানুষকে নেমে যেতে দিচ্ছে না, উচ্চ, উচ্চতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তাই সত্যিকার উন্নয়ন। মানুষের সমস্ত ভৌতিক ও মানসিক উন্নতির মূলে ওই ঊর্ধ্বপ্রেরণা। ওই প্ররোচক শক্তি।

কিন্তু ধর্ম কি দারিদ্র্য দূর করতে পারে? পারে না। বলছেন স্বামীজি, কত কিছু দিয়েই তো কত কিছু হয় না। মনে করো, তুমি একটা জ্যোতিষিক সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে চেষ্টা করছ, একটি শিশু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে জিগগেস করল, এতে কি কিছু খাবার পাওয়া যায়? তুমি উত্তর দিলে, না, তা পাওয়া যায় না। তখন শিশু বললে, তবে ও দিয়ে কী লাভ হবে? শিশু তার নিজের দৃষ্টি দিয়ে সমগ্র জগতের লাভালাভের বিচার করে। তেমনি যারা স্বল্পদৃষ্টি, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, তাদের বিচারও ঐ শিশুর বিচার। হীরে কিনতে গিয়ে বেগুনওয়ালার ছ আনা সের দাম দেওয়ার মত। প্রত্যেক বিষয়কে তার নিজ-নিজ ওজনে বিচার করতে হবে। অনন্তকে বিচার করতে হবে তাই অনন্তের ওজনে। ধর্ম মানুষের সর্বাংশ, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ—সমস্তকে নিয়ে, সমস্তকে আশ্রয় করে। তাই শুধু ক্ষণকালের ভিত্তিতে তার মূল্যনির্ণয় ন্যায়সংগত হবে না।

ধর্ম তো অনেক কিছুই পারে না। কিন্তু, বলতে গেলে, পারে কী? মনুষ্য